

শিশু কিশোর গল্প

ঐচ্ছানি ছানালি অতীত

সায়ি়দ আবুল হাসান আলী নদভী

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

অনূদিত



উৎসর্গ

প্রিয় ছাত্র, প্রিয় তালিবে ইলম

তুমি চেনো তোমাকে?

মনে হয় চেনো না!

তাহলে তোমার সংকল্প কোথায়?

আত্মপ্রত্যয়ে কেনো তুমি জ্বলে জ্বলে উঠতে পারো না?!

সত্য উচ্চারণে কেনো তোমার কণ্ঠে এতো আড়ষ্টতা?

বাতিলের চোখ-রাঙানিকে কেনো এতো ভয়?!

নাকি সত্য বুঝতেই তুমি অক্ষম?

কেনো তুমি প্রভাবক না-হয়ে শুধু প্রভাবিত হও?!

কেনো তুমি আলোকিত না হয়ে শুধু আঁধারে হারিয়ে যাও?!

কেনো তুমি যুগের ভাষা বোঝো না?

কেনো তুমি চারপাশের দোস্ত-দুশমন চেনো না?

তোমাকে শুধু গুণই অর্জন করতে হবে!

তোমাকে শুধু সাদাই থাকতে হবে!

তোমাকে শুধু আলোই বিলাতে হবে!

তোমাকে শুধু খালিস ইলমে ওহীর ধারক-বাহকই হতে হবে!

বিশ্বাস করো, তুমিই হতে পারো-

আগামী দিনের রাযি-গাযালী-আলী মিয়া!!

লাগবে শুধু তাঁদের ইখলাস ও সাধনা!

ভূমিকা

একটুখানি সোনালি অতীত শিশুসাহিত্যের একটি গল্পগ্রন্থ। এ গল্প কালজয়ী ও সত্যপুষ্ট। ইতিহাসের যে শ্রেষ্ঠ সময়টা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, এগুলো সেই সোনা-ফলানো সময়েরই সাক্ষ্য বহন করে। এ ইতিহাস শত্রুরা সব সময় আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে চায়। দুঃখজনক হলো, এ ইতিহাসের ব্যাপারে আমরাও যেনো কেমন উদাসীন।

শেষ দুটি গল্প বালাকোটের অমর শহীদ-সায়্যিদ আহমদ ইবনে ইরফান রহ.-এর হাতে গড়া বীরদের বীরত্বব্যঞ্জনায় ভাস্বর। পড়তে পড়তে মনে হবে- আমরা ফিরে গেছি বুঝি তাঁর যুগে!

গ্রন্থটি আরবীতে রচনা করেছেন প্রিয় রাহবার-আলী মিয়া নদভী রহ.। তাঁর পরিচয় নতুন করে কী আর দেবো? সবাই তোমরা তাঁকে জানো, চেনো!¹ আরবীতে তিনি নাম দিয়েছেন- *قصص من التاريخ الإسلامي*। আমরা এর বাংলা নাম রেখেছি- একটুখানি সোনালি অতীত।

কিতাবটি অনেকদিন থেকে আমার সংগ্রহে থাকলেও কখনো অনুবাদের তাড়া অনুভব করি নি। এমনকি পড়বো পড়বো করে পড়াও হয়ে ওঠে নি। এভাবে অনেক সময় চলে যাওয়ার পর একদিন দেখলাম- অনুবাদ হয়ে গেছে। এরপর অনুবাদের কোনো ইচ্ছা মনে উদয় হওয়ার কথা ছিলো না। কিন্তু সবকিছু নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হয় না। একটু খুলে বলি-

¹ এ জন্যে দেখতে পারো মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত এমন ছিলেন তিনি

এক অপরাহ্নে মাকতাবাতুদ দাওয়াহর পরিচালক মাওলানা সাঈদ আহমদ এলেন। তাঁর হাতে আলোচ্য কিতাবটি। অনুবাদের অনুরোধ। আমি তাকে জানালাম, এর তো অনুবাদ হয়ে গেছে! তিনি একধাপ সামনে বেড়ে বললেন, একাধিক! বললাম, তবুও কেনো? বললেন, তবুও! তারপর একরকম 'বিনীত জবরদস্তিতে' আমার উপর কিতাবটি 'চাপিয়ে দিয়ে' তিনি চলে গেলেন হজে। অনুবাদে হাত দিলাম। মাদরাসা বন্ধ। ছুটির আমেজে চলছিলো শায়খের শব্দ ও ভাবের ঘোর-লাগা 'মজার অনুবাদ'। হঠাৎ দেখলাম শেষই হয়ে গেছে! সময়ের আগেই! আলহামদু লিল্লাহ!! ভালো কাজ তাড়াতাড়ি হলে অনেক ভালো লাগে! এখন মনে হচ্ছে, মাওলানা সাঈদ আহমদ আমার প্রতি 'জবরদস্তি' নয়—'ইহসান'ই করেছেন!

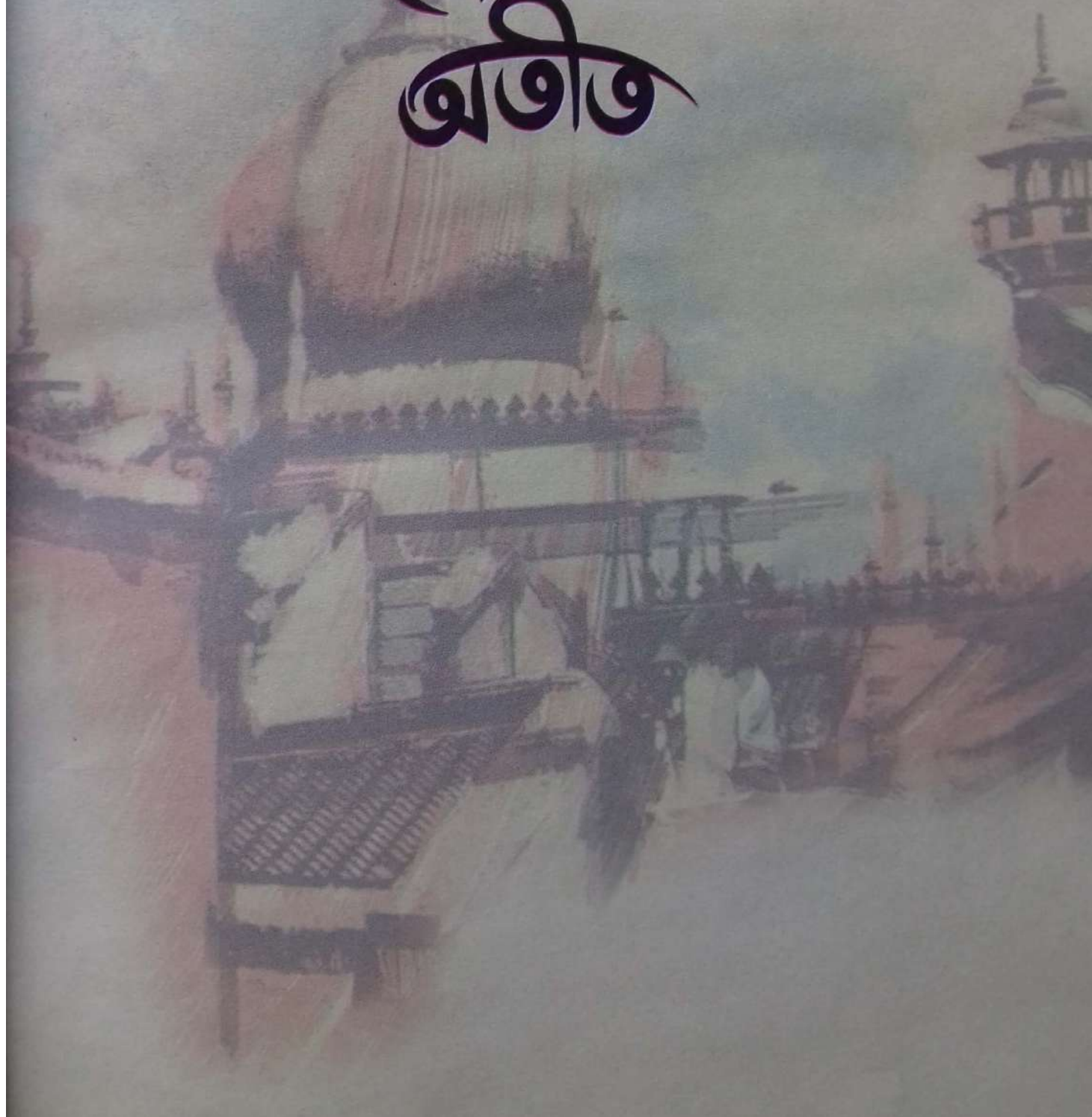
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচিপত্র

আল্লাহই হেফাযতকারী	৮
আকাশ থেকে নামলো যখন সুসংবাদের ধারা	১৪
এতিমের মহানুভবতা	২৫
এতিমের বীরত্ব	২৯
এই সব খুদে খুদে শহীদ	৩২
ওহদের কাছে এ কী ঘ্রাণ ভেসে আসছে	৩৭
শূলে চড়ানো খোবায়ব রা.	৫০
কাবার রবের শপথ- আমি সফল	৭১
এসো নবীজীর কাছে চিঠি লিখি	৭৬
একটুখানি 'বিলাসিতা' অনেকখানি তৃপ্তি	৭৯
বাইতুল মাকদিসের পথে হযরত উমর রা	৮৩
দানের আকাশ ঝরেই ঝরে	৯০
এমন শাসক কোথায় পাবে বলো	৯৬
সকল প্রশংসা শুধু তাঁর	১০০
এক মহানুভব দয়ালু বীরের কথা	১০৩
এভাবেই দিক বদলায়	১০৭
এভাবেই মন বদলায়	
এভাবেই ঈমানের হাওয়া বয়ে যায়	
ক্ষমা করে দিলে বিনিময় পাবে আল্লাহর কাছে	১১৫
আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যারা	১২০

শিশু কিশোর গল্প

প্রাচীন স্মারক অতীত





আল্লাহই হেফাযতকারী

এক.

বলতে পারো, আমাদের প্রিয়নবী কোথায় জন্মেছেন? সবাই জানে। নিশ্চয় তুমিও জানো! তিনি জন্মেছেন মক্কায়। এই মক্কাই ছিলো তাঁর দেশ। তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ। প্রিয়নবীর পূর্বপুরুষেরা মূর্তিপূজা করতো। সুন্দর ছিলো না তাদের জীবন। তাদের জীবনে ছিলো শুধু অন্ধকার। ঘরে অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার। ব্যক্তি জীবনে অন্ধকার। সমাজ জীবনে অন্ধকার। সবখানে অন্ধকার। স্তূপ স্তূপ অন্ধকার। বলে শেষ করা যাবে না। বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে যাবো। তুমিও শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তবুও কিছুই বলা হবে না। এই অন্ধকার প্রকৃতির অন্ধকার নয়। প্রকৃতির অন্ধকারে বাতি হলে .. আলো থাকলে পথ চলা যায়।

কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চলা যায় না। এ বড়ো ভয়ানক অন্ধকার।
কয়েকটা নাম বলি এই অন্ধকারের। শুনলে তুমি চমকে উঠবে!
মূর্তিপূজার অন্ধকার।

জুলুম-নির্যাতনের অন্ধকার।

অজ্ঞতা ও মূর্থতার অন্ধকার।

এতিমের মাল আত্মসাত করার অন্ধকার।

কন্যাসন্তানকে সহ্য করতে না পারার অন্ধকার।

আরো কী ভীষণ অন্ধকার!

সব কি আর যায় বলা?

না বলে শেষ করা যাবে?

কিন্তু আল্লাহ তো ভালোবাসেন বান্দাকে! এই অন্ধকারে বান্দারা পড়ে
থাকবে-ডুবে মরবে, সে তো হয় না! তাই আল্লাহ এই অন্ধকার থেকে
তাদেরকে উদ্ধার করতে চাইলেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)- কে পাঠালেন নবী করে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ।
নবী হওয়ার পর তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেলো। কখন কী করতে
হবে- সব আল্লাহ একে একে বলে দিচ্ছেন ওহী পাঠিয়ে। প্রিয়নবী
ওহী পেয়ে দাওয়াতের কাজে লেগে গেলেন। কাছের মানুষকে
ডাকলেন আগে-গোপনে গোপনে। মূর্তিপূজা ছাড়তে বললেন।
তাওহিদের দিকে ডাকলেন। আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকলেন।
কোন ইবাদতে কী লাভ- খুলে খুলে বলে দিলেন। কাছের মানুষ
সাড়া দিলেন। ঈমান কবুল করলেন। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ কাছের
হয়েও ঈমানের কাছে এলো না, উল্টো দূরে সরে গেলো। বরং
প্রিয়নবীর সাথে .. তাঁর সাহাবীদের সাথে দুশমনি শুরু করে দিলো।
ধীরে ধীরে মক্কায় মুসলমানদের টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে গেলো।
চারদিক থেকে নেমে এলো সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন।
আল্লাহর রাসূল সাহাবীদেরকে মক্কা ছেড়ে যেতে বললেন। সবাইকে
বললেন মদীনায় চলে যেতে। ঈমান বাঁচাতে। সবাই কাফের
মুশরিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে হিজরতের পথে বেরিয়ে যেতে লাগলো।
মক্কা থেকে মদীনা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মক্কা ছেড়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সাথে আছেন প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর রা.। তাঁরা প্রথমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গারে সাওরে। আল্লাহর হুকুমে গুহার মুখে কবুতর এসে বাসা বানিয়ে ডিমে তা দিতে লাগলো। যেনো অনেক দিন থেকেই এই বাসা। এ ছাড়া মাকড়সা গুহার মুখ জুড়ে বানিয়েছে কী সুন্দর জাল! আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গুহার সামনে একটা গাছ আল্লাহর রাসূল এবং আবু বকরকে বাইরের মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখলো। মনেই হয় না অমন গুহার ভেতরে কোনো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে! আল্লাহ এভাবেই প্রিয়দেরকে হেফাযত করেন। আল্লাহর সৈন্যবাহিনীর কোনো অভাব নেই-অসংখ্য অগণিত।

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورة الفتح؛
সাত আসমান আর জমিনের সৈন্যরা সব আল্লাহর ...!

সকালে খবর রটে গেলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর নেই! তাঁদের খোঁজে সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো সারা মক্কায়। সবাই মাঠে নেমে গেলো তাঁদের সন্ধানে। কিন্তু আশপাশে কোনো হাদিস মিললো না। তখন ‘পদচিহ্ন’ বিশেষজ্ঞরা পদচিহ্ন ধরে ধরে পৌঁছে গেলো ওই গারে সাওরের একেবারে কাছে। মাথাটা নিচু করে তাকালেই দেখে ফেলতে পারে তারা- আশ্রয়-নেওয়া শ্রেষ্ঠ নবী ও শ্রেষ্ঠ উম্মতিকে! কিন্তু তারা চাইলে কী হবে? আল্লাহ-যে চান নি! আল্লাহ না চাইলে কিছুই হয় না! কাফেররা ভাবলো, এখানে কেউ থাকতে পারে না। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না। কেউ ঢুকলে কি আর কবুতর এমন বসে থাকে? মাকড়সার জালও তো এমন ‘অবিচ্ছিন্ন’ থাকতে পারে না?! এই ছিলো গুহার বাইরের চিত্র। কিন্তু গুহার ভেতরের খবর কী? আবু বকর কি খুব ভয় পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, আবু বকর অনেক ভয় পেয়েছিলেন। গুহায় বসে যখন তিনি মুশরিকদের পা দেখতে পেলেন, তখন ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন কী হবে!

ওরা তো নিচের দিকে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে! আল্লাহর রাসূল ছিলেন খুব শান্ত। প্রশান্ত। বিচলনহীন। এমন তো হবেই! তিনি যে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নির্দেশ মতো সব করেছেন। তাঁর আর এখন কিছুই করার নেই। সব ভরসা এখন শুধু আল্লাহর উপর। তাই কোনো ভয় নেই তাঁর মনে। ভয়ের কোনো ছায়া নেই তাঁর চোখে। ভীত আবু বকরকে বললেন ভয়হীন শান্ত কণ্ঠে আস্থাভরা আওয়াজে—

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاتِّبَاعِنَا لِلَّهِ ثَلَاثُهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

‘আবু বকর! এমন দু’জনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয় হলেন (যাদের সাথে আছেন) আল্লাহ!’ -বুখারী, মুসলিম

দুই.

নবীজী এবং সাহাবীরা এখন সিক্ত হচ্ছেন মদীনার ভালোবাসায়। ইসলামের দাওয়াত চলছে পুরোদমে। বাড়ছে ঈমানদারদের সংখ্যা। মদীনায় ইসলামের এ অগ্রগতি দেখে কাফের মুশরিকরা মক্কায় বসে জ্বলতে লাগলো। ফুঁসতে লাগলো। ইসলামকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

মুসলমানেরা এখন আগের মতো সংখ্যায় দুর্বল না। জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করার অনুমতিও পেয়েছেন তারা। ঈমান বাঁচাতে আগে তারা হিজরত করেছেন। এখন ঈমান ও মদীনা বাঁচাতে তারা জিহাদও করবেন। ওরা অস্ত্র বহন করলে মুসলমানেরাও তলোয়ার হাতে তুলে নেবেন। এখন অস্ত্রে অস্ত্রে মুকাবিলা হবে। আর কোনো ছাড় নয়।

তিন.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন কাফেররা আসছে লড়তে। তিনিও সাহাবীদের নিয়ে বের হয়ে গেলেন। ওরা বের হলে তিনি কেনো বের হবেন না? কিন্তু তার আগে তোমাকে বলি, তুমি তো জানো— জিহাদের ডাক এলে

সাহাবায়ে কেরাম ঘরে বসে থাকতে পারতেন না-ছুটে যেতেন
আকুল হয়ে। চোখে-মুখে শাহাদতের লাল রং মেখে। কেননা তাঁরা
জানেন, জিহাদের ফযিলত। কোনো কোনো যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সঙ্গে থাকতেন। আর কোনো
কোনো যুদ্ধে নিজে না গিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন। প্রথমটি -নবীজী
সঙ্গে থাকলে- গায়ওয়া। দ্বিতীয়টি -নবীজী না গিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে
দিলে- সারিয়া।

এই যুদ্ধটা ছিলো গায়ওয়া-আল্লাহর রাসূল নিজে বের হয়েছেন।
যুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছেন দুপুরে। সময়টা ছিলো গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড
গরম। গা পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। আল্লাহর রাসূল তখনো মদীনা
থেকে দূরে। তাই গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিতে চাইলেন।
আরব দেশে তো আর সারি সারি গাছ নেই। বড় বড় গাছ নেই।
আছে শুধু মরুভূমির কাঁটা-বৃক্ষ।

এমনই একটা কাঁটা-বৃক্ষে নিজের তরবারিটা ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে
পড়লেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্যরাও
যে যার মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়লেন। সুবিধা মতো
জায়গায় শুয়ে পড়লেন।

তখন হলো কি, একটা মুশরিক পা টিপে টিপে আল্লাহর রাসূলের
একেবারে কাছে চলে এলো।

এসে তাঁর তরবারিটা নিয়ে নিলো!

নিয়ে খাপমুক্ত করলো!

অমনি আল্লাহর রাসূল ঘুম থেকে জেগে উঠলেন!

মুশরিক লোকটা খাপখোলা তরবারি উঁচিয়ে ধরে বললো :

‘আমাকে ভয় পাও?’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

‘না!’

মুশরিকটা এবার বললো :

‘কে তোমাকে আমার হাত থেকে এবার রক্ষা করবে, বলো!’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত কণ্ঠে বললেন :

‘আল্লাহ!’

এবার ঘটলো আশ্চর্য ঘটনা! ‘আল্লাহ’ শব্দ শুনতেই ওই মুশরিকের হাত কাঁপতে লাগলো। তরবারি পড়ে গেলো। তখন আল্লাহর রাসূল তরবারিটি নিয়ে বললেন :

‘বলো তো, এখন আমার হাত থেকে তোমায় কে বাঁচাবে?!’

মুশরিকটা কী বললো তখন? কাঁপা-কাঁপা ভীতকণ্ঠে বললো :

‘আমার প্রতি দয়া করুন! আমাকে ছেড়ে দিন!!’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন :

‘তুমি কি আল্লাহকে এক উপাস্য বলে মানো? আমি যে তাঁর রাসূল-এ কথা স্বীকার করো?’


মুশরিকটা বললো :

‘না! তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ককখনো আপনার সাথে লড়তে আসবো না! যারা আপনার সাথে লড়তে আসবে, তাদের সাথেও আমি থাকবো না!’

আল্লাহর রাসূল সুযোগ পেয়েও এই জানি দুশমনের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না-ছেড়ে দিলেন।

চার.

লোকটি ফিরে গেলো সঙ্গীদের কাছে। তার চোখে বিস্ময়। মুখে বিস্ময়। সবাইকে এসে বললো, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমি এখন এক মহানুভব মানুষের কাছ থেকে ফিরে এসেছি!



আকাশ থেকে নামলো যখন সুসংবাদের ধারা

এক.

মুহাজির কারা? যারা মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছেন। মদীনাকেই বানিয়েছেন আবাস-কেন্দ্রবিন্দু। তাঁরা-যে মদীনায় এসেছেন, খুব স্বাভাবিকভাবে কিছু আসতে পারেন নি। সবকিছু ফেলে আসতে হয়েছে। ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসতে হয়েছে। ধন-সম্পদও রেখে আসতে হয়েছে। অনেক আত্মীয়-স্বজনকেও কাফের-মুশরিকদের ‘দয়া-মায়া’র উপর ছেড়ে আসতে হয়েছে। তাঁদের এই ত্যাগ ও বিসর্জন বৃথা যায় নি। আল্লাহ তাঁদেরকে সুন্দর উপাধী দিয়েছেন। ‘মুহাজির’। এই উপাধী কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

মদীনার বাসিন্দারা মনে-প্রাণে স্বাগত জানিয়েছেন মক্কার এই মুহাজিরদেরকে। খুশি হয়ে বুকে টেনে নিয়েছেন। হর্ষোল্লাসে বলে উঠেছেন- আহলান ওয়া সাহলান! এসো এসো, স্বাগতম! মুহাজিরদের তো আর ঘর-বাড়ি ছিলো না। তাই বলে এ সব নিয়ে মোটেই তাঁদের ভাবতে হয় নি। মদীনাবাসীরা নিজেদের ঘরে তাঁদেরকে থাকতে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের ধন-সম্পদও মুহাজিরদেরকে ভাগ-ভাগ করে দিয়েছেন। এই মদীনাবাসীদেরকেও তাঁদের সাহায্যের জন্যে একটি উপাধী দিয়েছেন আল্লাহ। বলতে পারো কী এই উপাধী! ‘আনসার’! কী সুন্দর উপাধী! যেমন তাঁদের কর্ম, তেমন উপাধী!

অবশ্য মুহাজিরগণ আনসারদের সাহায্য নিতে চাইলেন না। তাঁদের উপর বোঝা হয়ে থাকতে চাইলেন না। বরং মুগ্ধ কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদ ও বাল-বাচ্চার প্রতি বরকত দান করুন! আমাদের এ-সবের প্রয়োজন নেই! আমাদেরকে শুধু বাজারটা চিনিয়ে দাও! দেখবে, আমরা ঠিক ব্যবসা করে করেই চলতে পারবো! নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবো!

দুই.

তাই হলো। মুহাজিরগণ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিলেন। আর দেখতে দেখতেই তাঁরা বড় বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন! আল্লাহ অনেক বরকত দিলেন তাঁদের ব্যবসায়!

মুহাজির এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর আগমনের আগে এই মদীনাকে বলা হতো ‘ইয়াসরিব’। এখন এই নাম বদলে গেছে। এখন ইয়াসরিব ‘মাদীনাতুর রাসূল’-রাসূলের শহর! সবার মুখে এই নাম! কেউ বলেন শুধু মদীনা!

রাসূলের শহর এই মদীনা এখন ইসলামের শহর। একমাত্র ইসলামের শহর। এমন শহর আর কোথাও নেই। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং পরিণতিতে নির্যাতনের কবলে পড়লে হিজরত করেন এই মদীনায়। মদীনা এখন ঈমানদারদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ নগরী।

মদীনা ইসলামের শহর হওয়ার কারণে ইসলামের মাদরাসাও।
ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সবাই এখানে ছুটে আসেন দীন
শিখতে। কুরআন শিখতে। হালাল-হারাম জানতে। কী করণীয়
আর কী বর্জনীয়- তাও জানা যায় শুধু এই মদীনায়। মদীনার এই
মাদরাসায়। নামায-রোযাসহ ইসলামের সমস্ত বিধান এখানে
এসেই শিখতে হয়। এমন মাদরাসা সারা বিশ্বের কোথাও আর
নেই। মদীনা ছাড়া। মদীনাই ইলমের প্রাণকেন্দ্র। এখানে না-এলে
কেউ জানতে পারবে না-
নামায কীভাবে পড়তে হয়।
রোযা কীভাবে রাখতে হয়।
কেমন করে আল্লাহর ইবাদত করবে।
এই ইলম ছাড়া বেঁচে থাকাই তো সম্ভব না!
তাহলে বলো, ইলম শিখতে হলে এই মদীনা ছাড়া আর কোথায়
যাবে মুসলমান?
মক্কায়? না!
তাহলে তায়েফ? তাও না!
তায়েফে-মক্কায় কেউ ইলম শেখায় না। দীন শেখায় না।
মদীনাই ইলম ও দীন শেখার একমাত্র কেন্দ্র।
যেতে হলে যেতে হবে শুধু মদীনায়।
তাই ইসলাম কবুল করেই আরবের নানা প্রান্ত থেকে সাহাবীরা ছুটে
ছুটে আসতেন এই মদীনায়। কেউ আসতেন হিজরত করে, দীন
বাঁচাতে। জীবন বাঁচাতে। কেউ আসতেন ইলম ও দীন শিখতে।
এরা মদীনায় সবাই ইসলামের মেহমান। প্রিয় নবীর অতিথি।
সবাই ছুটে আসতেন নবীজীর কাছে। নবীজী তাদেরকে কাছে পেয়ে
খুব খুশি হতেন। সবাইকে সাদরে গ্রহণ করতেন। বলতেন,
আহলান ওয়া সাহলান! স্বাগতম তোমাদেরকে!
এরা তো সবাই আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর রাসূলের মেহমান।
নবীজী তাই এদেরকে খুব সম্মান করতেন। সমাদর করতেন। যত্ন
করতেন। খাওয়া-দাওয়ার খুব খেয়াল রাখতেন। নিজে ক্ষুধায় কষ্ট

পেতেন, কিন্তু এই মেহমানদেরকে কষ্ট দিতে চাইতেন না। নবীজী খাবার পেলে খেতেন আর আল্লাহর শোকর আদায় করতেন। না-পেলে খেতেন না, সবর করতেন। ধৈর্য ধরতেন। এমন কতো হয়েছে যে, নবীজীর ঘরে রান্নাই হয় নি! চুলায় আগুনই জ্বলে নি! কিন্তু মেহমানের কষ্ট তিনি মেনে নিতে পারতেন না! মেহমানের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এরা তো আল্লাহর মেহমান! ইসলামের মেহমান! তাই তাঁরও মেহমান! তিনি বলেছেন-

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

‘যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেনো নিজের মেহমানের সম্মান করে।’ -বুখারী, মুসলিম

তিন.

মদীনার পরিবেশ ছিলো সুন্দর। আন্তরিকতাপূর্ণ। সবাই ভাই ভাই। ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ। মদীনা যেনো একটি ঘর। সবাই যেনো এই ঘরের এক পরিবার। মদীনায় কোনো মেহমান এলেই মেজবান হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো। আল্লাহর রাসূল তখন ভাগ-ভাগ করে দিতেন। এর বাড়িতে কয়েকজন। আরেকজনের বাড়িতে আরো কয়েকজন। কম হলে একজন একজন করে বণ্টন করে দিতেন। মেহমান নিয়ে সাহাবীরা গৃহে ফিরে যেতেন আনন্দে উড়তে উড়তে। তারপর মন উজাড় করে মেহমানদারি করতেন। ঘরের শ্রেষ্ঠ খাবার খাওয়াতেন। এই মেহমানরা মদীনায় মেজবানদের গৃহে গিয়ে উঠতেন ঠিক আপন মানুষের মতোই। যেনো নিজেরই ঘর। অনেক দিন ছিলেন না, এখন এসেছেন!

কী আদর! কী যত্ন!

হবেই তো এমন!

আল্লাহর মেহমান-যে তাঁরা!

আল্লাহর রাসূলের মেহমান-যে তাঁরা!

চার.

এবার মজার ঘটনা শোনো!

মদীনার এক আনসারী সাহাবী। নাম আবু তালহা আলআনসারী রা.। তিনি ভালোবাসতেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। আল্লাহর রাসূলও তাকে ভালোবাসতেন। হযরত আবু তালহা রা.-এর অনেক বাগান ছিলো। একটি বাগান ছিলো আল্লাহর রাসূলের খুব প্রিয়। কী মিষ্টি মিষ্টি ছায়া! সবুজে সবুজে যেনো রাশিরাশি মায়া! এই বাগানে আরো আছে সুপেয় পানি! কী সুমিষ্ট! (যেনো জমজম!) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে ওই বাগানে গিয়ে বসতেন। সুমিষ্ট পানি পান করতেন।

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা রা.-এর বাগানে গেলেন। সঙ্গে আছেন সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রা.। আল্লাহর রাসূল বাগানে বসে পানি খেলেন। তৃপ্ত হলেন। খুশি হলেন। এর মাঝে ছুটে এলেন আবু তালহা রা.। নবীজীকে কাছে পেয়ে তাঁর কী আনন্দ! তিনি তাঁদের জন্যে বকরী জবাই করতে চাইলেন! আল্লাহর রাসূল তখন বললেন—

"لا تذبح ذات ولد وذات لبن!"

মা-বকরী এবং দুধ-বকরী কোনোটাই জবাই করবে না (হে আবু তালহা)!

আবু তালহা তাই করলেন। রান্না হয়ে গেলো। আল্লাহর রাসূল এবং আবু বকর খেলেন। পান করলেন সুমিষ্ট পানি। আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। আবু তালহা রা.-এর জন্যে অনেক দুআ করলেন। এমন করে আবু তালহা সঞ্চয় করেছেন অনেক নবীপ্রেম। তাঁর অনেক দুআ। তাঁর অনেক ভালোবাসা।

পাঁচ.

একবার আল্লাহর রাসূলের কাছে অনেক মেহমান এলেন। তিনি তাদেরকে ভাগ করে দিলেন। যে যার ভাগ নিয়ে খুশিমনে গৃহের পথ ধরলেন। আবু তালহা রা.-এর ভাগেও মেহমান মিললো।

তিনিও তাঁর মেহমান নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। এই মেহমান পেয়ে আবু তালহা রা. খুব খুশি। কারণ এ মেহমান সাধারণ কোনো মেহমান নন, আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর রাসূলের মেহমান। ইসলামের মেহমান। এই মেহমানকে খাওয়ালে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহর রাসূল খুশি হবেন। পরকালে মিলবে অনেক বিনিময়। মহাবিনিময়। আবু তালহা রা. বাড়ির পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। তিনি এখনো জানেন না- কী আছে আজ খাবার। আছে তো?! বেশ দেরি করে আবু তালহা বাড়ি ফিরছেন। স্ত্রী উম্মে সোলাইম কী রান্না করেছেন, তিনি জানেন না। সবার খাওয়ার পরে মেহমানকে খাওয়ানোর মতো কোনো খাবার অবশিষ্ট থাকবে কি না- তাও আবু তালহার জানা নেই।

শিশুরা কি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি খাবার এখনো খায় নি? বসে বসে অপেক্ষা করছে? এ-ও চিন্তা করেন নি আবু তালহা। আবু তালহার মাথায় কোনো চিন্তাই কাজ করছে না। তাঁর একটিই চিন্তা- তিনি মেহমান পেয়েছেন। তিনি মেহমান নিয়ে ফিরছেন। একটু পরই মেহমানকে খেতে দেবেন। নিজেও খাবেন। খেতে যতো না তাঁর তৃপ্তি হবে, মেহমানকে খেতে দেখতে তারচেয়ে আরো বেশি তৃপ্তি হবে। আবু তালহা আনন্দের সাথে পথ চলছেন। পেছন পেছন হাঁটছেন মেহমান। তিনিও খুশি। মেজবানের মুখে আনন্দরেখা ঝলমল করলে সব মেহমানই খুশি হন।

হয়.

আবু তালহা দরোজায় আওয়াজ দিলেন। সুউচ্চ মধুর কণ্ঠে সালাম দিলেন। ভেতরে প্রবেশের 'অনুমতি' চাইলেন। ভেতর থেকে ভেসে এলো উচ্ছ্বসিত ক্ষীণকণ্ঠ- ওয়া আলাইকুম আসসালাম! ভেতরে প্রবেশ করুন!

আবু তালহা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আনন্দভরা এবং সুসংবাদমাখা কণ্ঠে স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন- আমার সাথে আছেন আল্লাহর রাসূলের মেহমান!

ভেসে এলো আবার উম্মে সোলাইমের আনন্দ-কণ্ঠ- আল্লাহর রাসূলের মেহমানকে স্বাগতম! আমরা ধন্য!!

আবু তালহা এবার স্ত্রীর কাছে অনুচ্চকণ্ঠে জানতে চাইলেন- বলো তো দেখি, কী খাওয়াবে মেহমানকে! কী আছে আজ আমাদের গৃহে?!

উম্মে সোলাইম বললেন একই কণ্ঠে, নিরুদ্বেগ-আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে- শুধু বাচ্চাদের খাবার আছে! ওরা এখনো খায় নি-বসে বসে অপেক্ষা করছে!!

আবু তালহা একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন। এখন কী করবেন! এ খাবার তো পরিবারের সদস্যদের জন্যেই যথেষ্ট না?! মেহমানকে তাহলে কী খাওয়াবেন? কেমনে খাওয়াবেন?!! আবু তালহা মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো! চমৎকার একটি বুদ্ধি তাঁর মাথায় এসেছে। আলহামদু লিল্লাহ! মহানুভবেরা কখনো মহানুভবতায় বিপদে পড়েন না; একটা না একটা সমাধান বেরিয়েই আসে। আবু তালহা রা.-এর সামনেও সমাধান বেরিয়ে এলো। আবু তালহা রা. সিদ্ধান্ত নিলেন আজ তিনি নিজে উপোস থাকবেন! কিছু খাবেন না! মেহমানের জন্যে! মেহমানের সম্মানে! আল্লাহ রাসূলের মেহমানকে খাওয়াতে গিয়ে নিজে একটা রাত অভুক্ত থাকলে কী এমন হবে! কষ্ট তো তিনি জীবনে কতোই করেছেন! আজ একটু সহিবেন ক্ষুধার কষ্ট! শুধু মেহমানকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করতে!

কিন্তু আবু তালহা কি একাই ভোগ করবেন এই মিষ্টি ক্ষুধার কষ্ট? না না! সঙ্গে থাকবেন প্রিয়তমা উম্মে সোলাইমও! তিনিও আজ মেহমানের জন্যে প্রিয় স্বামীর সাথে বরণ করে নেবেন ক্ষুধা! কী হবে এক রাত না খেলে?! মৃত্যু তো আর হবে না!

কিন্তু শুধু তারা দু'জনই কি ক্ষুধার্ত থাকবেন? ... বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে গেলেও তো পুরো খাবারই 'সাবাড়' হয়ে যাবে? ... এর মানে বাচ্চাদেরকেও আজ খেতে দেওয়া যাবে না? যে কোনোভাবেই ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে?

হ্যাঁ, বিষয়টা তাই! আজ পরিবারের সবাই মিলে উপোস করবেন শুধু মেহমানের জন্যে!! আল্লাহ্ আকবার!

সাত.

উম্মে সোলাইমের দায়িত্ব বেড়ে গেলো। মিষ্টি মিষ্টি প্রবোধে তিনি বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁদের এই মিষ্টি-মধুর সূক্ষ্ম কৌশল হোঁচট খেলো অন্য জায়গায় এসে! সে হলো, মেহমান খাবেন যখন, তখন তো একা খেতে চাইবেন না! মেজবানকেও সাথে বসে খেতে হবে! এটিই নিয়ম! তখন কী হবে? পরিকল্পনা যে ভেসে যাবে! খাবার তো অল্প! মেহমানের সাথে আবু তালহা এবং উম্মে সোলাইম যোগ দিলে হবে না, হবে না! ক্ষুধা ক্ষুধাই থেকে যাবে! কারো পেট ভরবে না! মেহমানেরও না! মেজবানেরও না! কী তাহলে করা?!

আবারো আবু তালহা ডুব দিলেন সমাধান-চিন্তায়! মহানুভবের জন্যে সুন্দর ও মিষ্টি সমাধান যেনো প্রতীক্ষায় বসে থাকে! এখানেও তাই হলো। আবু তালহা ও উম্মে সোলাইম মিলে বের করলেন এক অভাবনীয় সমাধান! একটু খুলে বলি?

মেহমান যখন খেতে বসবেন তখন উম্মে সোলাইম আরেকটি ভূমিকা পালন করবেন! হঠাৎ করে তিনি মেহমানের সামনে-থাকা বাতিটি এমনভাবে এসে নিভিয়ে দেবেন, যেনো তিনি ঠিকঠাক করতেই এসেছিলেন! কিন্তু অনিচ্ছাতেই নিভে গেলো! এদিকে বাতি জ্বালাবার কোনো তাৎক্ষণিক পথও সামনে খোলা নেই! ব্যস্, তখন অন্ধকারেই মেহমানকে খেতে হবে! আর ... থাক! পরের কথাটি এখানে আর না-বললাম! তুমি সামনে গেলেই বুঝতে পারবে!

* * *

তাই হলো। আবু তালহা খাবার এনে রেখেছেন মেহমানের সামনে। একটু পরই খাওয়া শুরু হবে! মেহমানের সাথে খাবেন মেজবানও! কিন্তু হঠাৎ বাতির আলো চলো গেলো!

ঘোর অন্ধকার নেমে এলো! শুধু 'ঠাহর' করা সম্ভব হচ্ছিলো যে, খাবারটা মেহমান-মেজবান সবার সামনেই আছে! হাত বাড়ালেই খাওয়া যাবে!

আট.

অন্ধকারেই খাচ্ছেন মেহমান আর কথা বলছেন। আবু তালহা ও উম্মে সোলাইমও মেহমানের সাথে খাওয়ার ভাব দেখাচ্ছেন! হাত নাড়ছেন! ঠোট নাড়ছেন! চুকচুক শব্দও হচ্ছে! কিন্তু আসলে তাঁরা খাচ্ছেন না! এদিকে মেজবানের আচরণে মেহমানের বিন্দুমাত্র সন্দেহও হলো না যে, মেজবান খাচ্ছেন না, বরং আশ্রয় নিয়েছেন মেহমানকে খাওয়ানোর এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার এক অভিনব কৌশলের!

* * *

এভাবেই এক সময় মেহমানের খাওয়া শেষ হলো। মেহমান হাত ধুইলেন। আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। মেজবানের প্রতি ঢেলে দিলেন রাশিরাশি কৃতজ্ঞতা। দুআ করলেন খায়র ও বরকতের! আবু তালহাও উঠে গিয়ে হাত ধুইলেন।

আহা, দুই হাত ধোয়ায় কতো পার্থক্য!

মেহমান তৃপ্তিভরে আহারের পর হাত ধুইছেন!

মেজবান একরাজ্য ক্ষুধা পেটে নিয়ে খাদ্য-তৃপ্ত মানুষের মতোই হাত ধুইছেন! থাক পেটে রাজ্যের ক্ষুধা! মনে তো সাঁতরে বেড়াচ্ছে আনন্দ ও খুশির সাদা সাদা করুতর!! মেহমানদারির এই মহাদায়িত্ব পালন করতে পারার পর কে-না খুশি হবেন?

নয়.

প্রতিদিনের মতো আবু তালহা ফজর পড়তে মসজিদে নববীতে গেলেন।

পেটে বেসামাল ক্ষুধার দহন ও জ্বালা!

মনে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি!

এ-ই তাকে প্রাণ-প্রাচুর্যে সজীব করে রেখেছে!
তিনি যেনো জান্নাতি! খেয়ে এসেছেন জান্নাতের খাবার!!

দশ.

আবু তালহা রা. ভেবেছিলেন- তাঁর এই মেহমানদারির গোপন কথা গোপনই থাকবে-কেউ জানবেন না-তিনি আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া! কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহকে তিনি লুকোবেন কেমনে?! আল্লাহ তো সবই জানেন! প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব!

আল্লাহ তাঁদের এই আচরণে খুব সন্তুষ্ট হলেন! প্রিয়নবীর উপর আয়াত নাযিল করে তিনি এ রহস্য সবার কাছে প্রকাশ করে দিলেন!

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাব ও ক্ষুধাক্লিষ্ট থাকার পরও। সূরা হাশর : ৯

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সাহাবী আবু তালহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী! আবু তালহা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন! সব শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন খুশি হলেন। তার মহানুভবতায় খুব সন্তুষ্ট হলেন।

* * *

আল্লাহর রাসূল খুশি ও সন্তুষ্ট হলে আর কী লাগে?!
সর্বোপরি সেই সন্তুষ্টি ও খুশির কথা আকাশ থেকে নেমে এলে সৌভাগ্যের কি কোনো সীমা থাকে?
একটু কল্পনা করো, আবু তালহা রা, উম্মে সোলাইম রা. কী পরিমাণ খুশি হতে পারেন!

আসমানের প্রশংসা কয়জনের ভাগ্যে নেমে আসে?!
আসমানী প্রশংসার ডালি কয়জনের জন্যে চিরনিবেদিত হতে থাকে?
এই আয়াত যে পড়ে, সে-ই তো জানতে চায়-
কে তারা? কারা অমন মুক্ত-উদার মহানুভব?!

কাদের জন্য ভেসে আসে আসমানের বার্তা?
তখন উত্তরে কী ভেসে আসে? ...
লক্ষ কোটি অযুত কণ্ঠে ভেসে আসে মুক্ততা মেশানো উত্তর-
তিনি আবু তালহা আলআনসারী রা.!
তঁার স্ত্রী মহীয়সী উম্মে সোলাইম রা.!
শুধু কি তঁরাই?
নাহ, সাথে আছে তঁাদের ছোট সোনামণিরা! তঁরা না ঘুমোলে এবং
কান্নাকাটি জুড়ে দিলে সবই তো অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো!
পারতো না?



এতিমের মহানুভবতা

ঘটনা মদীনার। হঠাৎ করে ঘটনায় আমরা প্রবেশ করতে পারবো না। আসতে হবে মক্কা হয়ে। তবেই এই ঘটনার মহিমা হৃদয়ের গভীরে আলো ছড়াবে।

আল্লাহর রাসূল মক্কার মানুষকে দাওয়াত দিলেন। সমবেত মানুষের উদ্দেশে বলে উঠলেন- হে মানুষেরা, হে লোকেরা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই!

এ কথা শুনে .. এ দাওয়াত শুনে কুরাইশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়লো। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামের বানানো কা'বায় তখন ছিলো ৩৬০ মূর্তি। এগুলিকে কুরাইশ পূজা করতো। এই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলায় কুরাইশ সীমাহীন ক্ষেপে গেলো।

আল্লাহর রাসূলকে কটুকথা বলতে লাগলো । তাঁকে কষ্ট দিতে লাগলো ।
সাহাবীদের উপর জুলুম-নিপীড়ন শুরু করলো ।
কিন্তু আল্লাহর রাসূল অটল-অবিচল ।
সাহাবীরাও অটল অবিচল ।
আল্লাহর রাসূল সব সয়ে যেতে লাগলেন ।
সাহাবীরাও সব সয়ে যেতে লাগলেন ।
কুরাইশের জুলুম যতো বাড়ে আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীদের
অবিচলতাও ততো বাড়ে ।
ওদের জুলুমের তাণ্ডব যতো ভয়ানক হয় মুমিনদের ধৈর্যের মহিমা
ততো আলো ছড়ায় ।
ওদের জুলুম যেনো ছোট টিলা ।
আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীদের অবিচলতা ও ধৈর্য যেনো উঁচু উঁচু
পাহাড় ।

* * *

কিন্তু কুরাইশ বেপরোয়া । যে কোনো মূল্যে তারা মুসলমানদেরকে
ইসলাম থেকে দূরে রাখতে চাইলো । মূর্তিপূজা ছেড়ে কেউ আল্লাহর
ইবাদত করতে পারবে না- এই লক্ষ্য নিয়ে ওরা মাঠে নামলো ।
অবশেষে আল্লাহর রাসূল সাহাবীদেরকে মক্কা ছাড়তে বললেন ।
মদীনায় হিজরত করতে বললেন । রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে
তখন একে একে প্রায় সবাই হিজরত করলেন মদীনায় ।

* * *

মদীনা সবাইকে আশ্রয় দিলো । থাকার জায়গা দিলো । হৃদয় বিছিয়ে
বরণ করে নিলো ।

কী সুন্দর মদীনা!

কী দয়ালু ও মমতাঘেরা মদীনার বাসিন্দারা!

মদীনার অনেক মানুষ হিজরতের বেশ আগেই ইসলাম কবুল করে ধন্য
হয়েছিলেন । এখন তাঁরা আল্লাহর রাসূল এবং মক্কার সাহাবীদেরকে
স্বাগত জানানোর জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন । আল্লাহর
নবীও কিছুদিন পর চলে এলেন প্রিয় মদীনার প্রিয় মানুষের কাছে ।

* * *

মদীনায় গিয়েই আল্লাহর রাসূল আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর বাড়ির সামনের খালি জায়গাটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের আশ্রয় প্রকাশ করলেন। মসজিদ ছাড়া তো মুসলমানদের চলে না। তাই তিনি একটুও দেরি করতে চাইলেন না। মসজিদ হলো এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলে মুসলমানদের জীবনের চাকা।

আগেই বলেছি আবু আইয়ূব আনসারীর কথা। হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই আল্লাহর রাসূল মেহমান হয়েছিলেন। অনেকদিন। সামনেই ছিলো ওই খালি জায়গাটি। খেজুর রাখা হতো এখানে। উটও বেঁধে রাখা হতো। আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন— কার এ জায়গাটি? তখন আনসারী সাহাবী মুআয ইবনে আফরা বললেন, এ জমির মালিক দুই এতিম বালক। সাহল ও সোহায়ল। আল্লাহর রাসূল দুই ভাইকে ডাকালেন। জমিটি কেনার প্রস্তাব দিলেন। দুই ভাই বয়সে ছোট হলে কী হবে! বিজ্ঞজনের মতো উত্তর করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এ জমি তো আল্লাহরই! আমরা এমনিতেই আপনাকে তা দিয়ে দিচ্ছি, কোনো মূল্য পরিশোধ করতে হবে না! আপনি এখানে মসজিদ বানাতে আমাদের অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যাবে! আমাদের অনেক ভালো লাগবে! মূল্য নিলে এই ভালো লাগাটা থাকবে না! কিন্তু আল্লাহর রাসূল মানুষের হক আদায় করতেন। কারো হক একটুও নষ্ট হতে দিতেন না। এই এতিমদ্বয়ের হকও তিনি নষ্ট হতে দিলেন না। বরং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তিনি জায়গাটি খরিদ করলেন।

* * *

মসজিদ নির্মাণের কাজও দ্রুতই শুরু হয়ে গেলো। সাহাবীরা সবাই নির্মাণ কাজে ব্যস্ত। কেউ পাথর আনছেন। কেউ মাটি খুঁড়ছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকলেন না। সবার সাথে তিনিও কাজে মিশে গেলেন—একেবারে জাত কামলার মতো। নবীজী প্রিয় সাহাবীদের সাথে কাজ করছিলেন আর বলছিলেন—

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة
'হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই সবচেয়ে বড় কল্যাণ। তুমি
আনসার-মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও!'

* * *

হযরত উসমান রা.-এর শাসনকালে মসজিদের পরিধি আরো বিস্তৃত
হয়। অন্যান্য মুসলিম খলীফা ও রাজা-বাদশারাও মসজিদে
নববীকে অনেক বড় করেন। অনেক সুন্দর করেন। এখন মসজিদে
নববী সেই আগের মতো আর নেই। এখন খুব সুন্দর! তাকালে
তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে! তুমি কি কখনো গিয়েছো পবিত্র সেই
মসজিদে? না গেলেও নিশ্চয়ই যেতে চাও! আল্লাহ কবুল করুন।
আল্লাহ খুব দ্রুত তোমাকে নবীর দেশে নিয়ে যাক! ওখানে গেলে
তোমার মনে পড়বে তো- ছোট সাহাবী সাহল-সোহায়লের কথা!

এতিমের বীরত্ব

বদর যুদ্ধের কাহিনী। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ডানে বামে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর পাশে দুই বালক। মু'আয বিন আমর বিন আলজামূহ এবং মু'আওয়ায বিন আফরা। তিনি আশা করছিলেন, তাঁর পাশে বড় কেউ হবে এবং তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কিন্তু এদেরকে দেখে তিনি তেমন খুশি হতে পারলেন না। তবে তাঁর অখুশি ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। একটু পরই তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, দুই বালকের এক বালক চাপাকণ্ঠে তাঁকে এসে আবু জেহেলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে! একটু পর অপরজনও তাঁকে এসে একই কথা জিজ্ঞাসা করলো! তখন তিনি তাদের কাছে কারণ জানতে চাইলেন। তারা পরিস্কার ভাষায় বললো— ‘আবু জেহেল আমাদের নবীজীকে গালিগালাজ করেছে! আজ আমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাই! আমরা তাকে জাহান্নামে পাঠাতে চাই!’

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাদেরকে কথা দিলেন। বললেন— ‘অবশ্যই আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, কে এই আবু জেহেল। একটু অপেক্ষা করো।’

যুদ্ধ শুরু হলো। আবু জেহেল মুশরিকদের সেনাপতি। নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলো। মুশরিক বাহিনীর কাতারে কাতারে ব্যস্ত ছুটোছুটি করছিলো।

এক সুযোগে তিনি বালকদ্বয়কে ডেকে আবু জেহেলকে চিনিয়ে দিলেন। বালকদ্বয় তখন আর বালক থাকলো না, বীর সৈনিকের মতো হয়ে গেলো! তাদের কচি-তাজা রক্তে যেনো আগুন জ্বলে উঠলো! শিকার লক্ষ্য করে তারা তীব্র বেগে ছুটে গেলো! তখন তখনই! এক মুহূর্তের জন্যেও তারা ভাবলো না- আবু জেহেল একজন ‘বড় মাপের’ যোদ্ধা। সেনানায়ক। আর তারা ছোট। একেবারেই ছোট। এ-সব তারা কিছুই ভাবে নি। তারা শুধু ভাবছিলো- আবু জেহেল নবীজীকে গালি দিয়েছে! আবু জেহেল নবীজীর দুশমন। ইসলামের দুশমন। এই আবু জেহেলের কোনো ক্ষমা নেই!

মুহূর্তেই তারা আবু জেহেলের কাছে পৌঁছে গেলো! দক্ষ রণ-কুশলীর মতো তরবারি হাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো! সেদিন বদর প্রান্তরে এই দুই কিশোরের বীরত্বের কাছে আবু জেহেল অধ্যায়ের শোচনীয় ভরাডুবি দেখে আসমানের ফেরেশতারা কি হল্লা করে বলে উঠেছিলো- ‘ওই দেখো! দুই খুদে সৈন্যের হাতে শত্রু-সম্রাটের কী করুণ পরিণতি!!’

খুব বেশি সময় লাগলো না, একটু পরই আবু জেহেলের মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা ফিরে এলো! ফিরে এলো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে! বিজয়ের নিশান উড়িয়ে! মুখে নবীপ্রেমের তাজা তাজা গোলাপ ফুটিয়ে!

এতোদিন প্রতিশোধের আগুনটা বুকে জ্বলছিলো! আজ জ্বলছে বাইরে! বদর প্রান্তরে! প্রতিশোধের সে আগুনে ভস্ম হয়েছে শয়তানের চিরমিত্র-আবু জেহেল!

তারা এসে যখন নবীজীকে ‘আবু জেহেল বধ-কাহিনী’ শোনালো,

তখন আল্লাহর নবী জানতে চাইলেন—

أَيُّكُمْ قَتَلَهُ؟ - ‘তোমাদের ভেতরে কে তাকে হত্যা করেছে?’

দু’জনই বললো—

أَنَا قَتَلْتَهُ - ‘আমি তাকে হত্যা করেছি!’

আল্লাহর নবী তখন বললেন—

هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ - ‘তোমরা কি তরবারি’র রক্ত মুছে ফেলেছো?’


তারা বললো—

না, এখনো মুছি নি!

নবীজী দেখলেন— দু’জনের তরবারিতেই রক্ত-চিহ্ন লেগে আছে।

তিনি বললেন—

كُلَا كَمَا قَتَلَهُ - ‘তোমরা দু’জন মিলেই তাকে হত্যা করেছো!’



এইসব খুদে খুদে শহীদ

এক.

আল্লাহর রাসূল বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একটু পরই রওয়ানা হবে এই জিহাদী কাফেলা। এই কাফেলায় মিশে যেতে চায়— ছোট্ট এক মুজাহিদ। কিন্তু বয়সটা যুদ্ধে যাওয়ার না। মাত্র ষোলো। কিন্তু এই ছেলে যুদ্ধে যাবেই। শাহাদত তার কামনা। শাহাদত তার বাসনা। শাহাদত তার স্বপ্ন। কিন্তু ‘স্বপ্নের সবুজ পৃথিবীতে’ প্রবেশ করতে বাধা হয়ে আছে এই বয়সটা। আল্লাহর রাসূল নিশ্চিত তাকে অনুমতি দেবেন না। কী তাহলে করা? যেতে তো হবেই! আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়! লুকিয়ে লুকিয়ে চলে গেলে সেই বদরের ময়দানে?! ওখান থেকে নিশ্চয়ই প্রিয় রাসূল ফেরত পাঠাবেন না!

দুই.

ছেলেটি তাই করলো। সৈন্যদের সাথে মিশে গেলো। নিজেকে নবীজীর দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। 'বাধাদানকারী দৃষ্টি' থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতে লাগলো।

ওর নাম উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর ছোট ভাই। বড় ভাইও যাচ্ছেন বদরে। হঠাৎ ছোট ভাই বড় ভাইয়ের চোখে পড়ে গেলো!

অমন করে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাওয়ার রহস্য কী?! বড় ভাই কারণ জানতে চাইলেন! ছোট ভাই আর এড়িয়ে গেলো না। বললো, আমিও যাবো! কিন্তু আশংকা করছি আল্লাহর রাসূল আমাকে নেবেন না-ফিরিয়ে দেবেন! আমি তো ছোট! কিন্তু আমি যেতে চাই! আমি শহীদ হতে চাই!!

তিন.

উমায়ের যা ভেবেছিলো তাই হলো। আল্লাহর রাসূল যখন উমায়েরকে দেখলেন, তখন ছোট হওয়ার কারণে তাকে 'না' বলে দিলেন! কেননা যুদ্ধ কোনো ছেলেখেলা নয়। বড়দের ময়দান। ছোটরা কী করবে যুদ্ধের ময়দানে নেমে? বড়রাই তো এখানে হিমশিম খায়?!

কিন্তু উমায়েরের ছোট্ট মন মানতে চায় না। তার একদমই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। কী করবে বাড়িতে বসে বসে? মদীনার সমবয়সী বন্ধুদের সাথে খেলতেও এখন ভালো লাগবে না। এখন কিছুই ভালো লাগবে না ওর-যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া!! শাহাদত যখন চোখের সামনে সবুজ আলো ছড়ায় তখন আর কিছু কি ভালো লাগে?!

কিন্তু আল্লাহর রাসূল তো 'না' বলে দিয়েছেন! এখন কীভাবে যাবে উমায়ের!

রাসূলের 'না' তো মানতে হবে!

এদিকে শাহাদতের লাল তামান্নার ডাকেও সাড়া দিতে হবে।

নইলে অনেক কষ্ট হবে!

কে না চায় শাহাদতের লাল সমুদ্র পেরিয়ে জান্নাতের সবুজ তীরে
নোঙর ফেলতে?

এ স্বপ্ন এখন কেমন করে পূরণ হতে পারে!

চার.

এ সব ভাবতে ভাবতে উমায়েরের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনের
ভেতরে পাথারচাপা কষ্ট ‘আহ আহ’ করতে থাকে।

উমায়েরের মনের আকাশ মেঘলা হতে শুরু করলো!

আকাশ মেঘলা হলে কী হয়? বৃষ্টি নামে!

এবার উমায়েরের মেঘলা আকাশও বর্ষণকাতর হয়ে উঠলো!

উমায়ের আর সহিতে পারলো না!

সবার সামনে হু হু করে কেঁদে ফেললো!!

এ কোমল নিষ্পাপ স্নিগ্ধ অশ্রুর সামনে আল্লাহর রাসূল গলে
গেলেন!

উমায়েরকে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন!!

পাঁচ.

জানতে চেয়ো না বন্ধু, উমায়ের এখন কতোটা খুশি! তার খুশির
কথা বলে শেষ করা যাবে না! আল্লাহর রাসূলের অনুমতি পাওয়ার
পর মনে হচ্ছিলো, ও যেনো জান্নাতের টিকিটই হাতে পেয়ে গেছে!
ওর চোখে ঝলমল করছিলো শাহাদতের ‘লাল-সবুজ’ স্বপ্ন!

উমায়ের বড় ভাই সা‘দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর সাথে রওয়ানা
হয়ে গেলো বদরের দিকে। সবাই বড় বড়। সবাই শক্তিশালী
যোদ্ধা। লড়াকু সৈনিক। উমায়ের ছোট। কিন্তু ওর চোখ দু’টি
জ্বলছিলো। যুদ্ধে নামার নেশায়। শহীদ হওয়ার বাসনায়।

ছয়.

না! উমায়ের মদীনায় আর ফিরে আসে নি!

ওর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে! ও বদরের একজন শহীদ!
ও শাহাদতের লাল বিছানায় শুইতে পেরেছে!
ও জান্নাতের সবুজ পাখি হতে পেরেছে! ওর চেয়ে বয়সে যারা বড়
ও শক্তিশালী, তাঁদের প্রায় সবাইকেই বুকের স্বপ্ন বুকে নিয়েই
ফিরতে হয়েছে!
ও বুকের স্বপ্ন ঢেলে দিয়ে এসেছে বদরের বালিরাশিতে!
ওর স্বপ্নে সেই ধূসর-ধূসর বালি লালে-লাল হয়ে গেছে!
হে অমর শহীদ! তোমার রক্ত অনেক দামী!!

সাত.

এবার আসি ওহুদের ময়দানের কথায়। ওহুদ যুদ্ধেও যখন আল্লাহর
রাসূল বের হলেন, তাঁর সাথে বের হলো একদল বালক। সবাই
ছোট। যুদ্ধে যাওয়ার এখনো সময় হয় নি। পনেরো বছরও হয় নি।
আল্লাহর রাসূল ওদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। এই ছোটদেরকে সঙ্গে
নিলে বড়দের যুদ্ধ করতে সমস্যা হবে। ওদেরকে দেখে দেখে
রাখতে হবে। চোখে চোখে রাখতে হবে।

কিন্তু রাফে ইবনে খোদায়জ দমলো না। যুদ্ধে যেতে ও কৌশলের
আশ্রয় নিলো। পনেরো বছরের ছেলে নিজেকে আরেকটু বড় করে
তোলার জন্যে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালো! একটু উঁচু
হওয়ার চেষ্টা করলো। বড়দের চোখে নিজেকে 'বড়' প্রমাণের
চেষ্টা! তবুও ওকে আল্লাহর রাসূল ফিরিয়ে দিলেন।

ছোট মানুষ কেমনে যুদ্ধ করবে? রাফের বাবা পাশেই ছিলেন। তিনি
প্রিয় রাসূলের কাছে ছেলের জন্যে সুপারিশ করলেন। বললেন, হে
আল্লাহর রাসূল, ও ভালো তীর ছুঁড়তে পারে! এ কথা শুনে আল্লাহর
রাসূল অনুমতি দিয়ে দিলেন!

রাফে সীমাহীন খুশি!

ঈদের দিন নতুন পোশাকে ঈদের মাঠের দিকে চলতে থাকা
শিশু-কিশোরদের চেয়েও অনেক খুশি!

আট.

রাফে গেলে আমি কেনো পারবো না? আমাকেও যেতে হবে! যুদ্ধের ময়দান তাকে ডেকে নিয়ে যেতে পারলে আমি কী অপরাধ করলাম? আমি কেনো যেতে পারবো না? ওর আব্বু সুপারিশ করেছে, ও এখন যেতে পারছে! আমার কি কোনো সুপারিশকারী নেই! কী করবো এখন আমি?! ... হ্যাঁ, এভাবেই ঝড় উঠলো আরেক বালকের মনে! ওর নাম সামুরা ইবনে জুনদুব। ওর বয়সও রাফের সমান। রাফের পর পর ও-ও যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে নিজেকে পেশ করলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে। কিন্তু তিনি ওকে ফিরিয়ে দিলেন। সামুরা নীরবে চলে গেলো না, কথা বলে উঠলো বুকে আশা নিয়ে, মনে স্বপ্ন নিয়ে। হে আল্লাহর রাসূল, রাফে যাবে আর আমি যাবো না! আমরা তো একই সমান! আমাদের মাঝে লড়াই হলে আমি ওকে ধরাশায়ী করে দিতে পারবো!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা আর রাফেকে মল্লযুদ্ধের অনুমতি দিলেন! ঘটলো তখন আশ্চর্য ঘটনা। যার হারার কথা ছিলো সে জিতে গেলো! যার জেতার কথা ছিলো সে হেরে গেলো। জিতলো সামুরা! শামিল হয়ে গেলো সামুরা ওহুদের যুদ্ধ কাফেলায়।

সামুরা ওহুদ যুদ্ধের সত্তর শহীদের একজন শহীদ!

সালাম তোমার হে শহীদ সামুরা! হে বিজয়ী মল্লযোদ্ধা!

ওহ্দের কাছে এ কী স্বাগ ভেসে আসে

এক.

ওহ্দের প্রবেশ করার আগে বদরের বীরত্ব দিয়ে কথা শুরু করি। মুশরিকদের সাথে লড়তে আল্লাহর রাসূল যখন বদরের পথে রওয়ানা হন, তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দেন নি। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী। অনেক সাহাবী প্রথমে এই অভিযানের কথা জানতে পারেন নি। কারা কারা এই অভিযানে সঙ্গে গিয়েছেন?

কেউ কেউ মেষ চরাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূলকে দেখে মিশে গেলেন! কেউ কেউ ফসলের ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন। তারাও নবীর সাথে শরীক হয়ে গেলেন! অনেকে বাগান পাহারা দিচ্ছিলেন। দেখাশোনা করছিলেন। তারাও নবীর ডাকে সাড়া দিলেন! কিছু মানুষ দোকান খুলতে এসে দেখলেন নবীজী যাচ্ছেন। সাথে আরো অনেকে। তাঁরাও ছুটে গেলেন। কাফেলায় শরীক হয়ে গেলেন! এভাবেই বদরের ৩১৩ জনের কাফেলা তৈরি হয়ে গেলো। সবাই বেরিয়েছিলো নিজ নিজ প্রয়োজনে। আপন আপন ব্যস্ততায়।

এইসব ব্যস্ততা নিয়েই কাটতো সাহাবীদের কর্মঘণ্টা। ইসলাম ও নবীর আনুগত্য যেমন তাদের কাছে প্রিয় ছিলো, তেমনি কাজও তাঁদের কাছে প্রিয় ছিলো।

দুই.

তাঁরা কেউ-ই জানতেন না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ বদরে যাচ্ছেন। আনাস ইবনে নদর রা. একটু পরে আলাদা হয়ে নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যদি জানতেন যে, আল্লাহর রাসূল যাচ্ছেন বদরে, মুশরিক বাহিনীর সাথে লড়াইতে, তাহলে তিনি কক্খনো নবীর সঙ্গ ছাড়তেন না! চলে যাওয়ার সময়ও তাঁর মনে ছিলো জিহাদী তামান্না। শহীদ হওয়ার বাসনা। আল্লাহ বদরে মুসলমানদেরকে দান করলেন বিজয়। মুশরিকরা পরাজিত হয়েছিলো শোচনীয়ভাবে। আর অপরদিকে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে। সত্তরটা বড় বড় মুশরিক নিহত হয়েছিলো। ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো। বন্দি হয়েছিলো আরো সত্তর। ওদের সেনাপতি আবু জেহেলসহ নিহত হয়েছিলো উতবা বিন রবীয়া, ওলীদ ও শায়বা।

তিন.

বদর ছিলো ‘ইয়াউমুল ফুরকান’-হক-বাতিরের মাঝে পার্থক্য-রেখা টেনে দেওয়ার লড়াই। কাফেরদের জন্যে দিনটা ছিলো ভীষণ কঠিন। আল্লাহ বদরী সাহাবীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। তাঁদেরকে বিনিময় দান করেছেন। এদিকে আনাস ইবনে নদর রা. জানতে পারলেন, আল্লাহর রাসূল বদরে গিয়েছেন। অন্য মুসলমানগণও তাঁর সাথে বদরে গিয়েছেন। মুশরিকদের সাথে লড়াই হয়েছে। আল্লাহ এক মহাবিজয় দান করেছেন। পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন আল্লাহর বন্ধু এবং শয়তানের বন্ধুদের ভেতরে। এই বিজয়ের পর আনন্দে মুসলমানদের চেহারা হয়েছে আলো ঝলমলে।

কাফের মুশরিকদের চেহারা হয়েছে আঁধারে আচ্ছন্ন। সব জেনে প্রিয় সাহাবী আনাস ইবনে নদরের আফসোসের কোনো সীমা রইলো না। প্রিয় রাসূলের কাছে ছুটে এলেন তিনি। এসে আফসোসঝরা কণ্ঠে বললেন—

غَيْبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ
لَعْنُ أَشْهَدَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِتَالًا لَيَرَيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ.

‘মুশরিকদের সাথে আল্লাহর রাসূলের সর্বপ্রথম অভিযানে আমি থাকতে পারলাম না! আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দেন অন্য কোনো অভিযানে (আল্লাহর রাসূলের সাথে) উপস্থিত থাকার, তাহলে আল্লাহ দেখবেন মুশরিকদের সাথে আমি কী লড়াটাই না লড়ি!’
এ কথা বলার সময় হযরত আনাসের গলা কাঁপছিলো— দুঃখে। হাত শক্ত হয়ে এসেছিলো— বীরত্বে। চেহারায় দ্যোতিত হচ্ছিলো— ঈমান। আর সব ভরসা এসে জমা হয়েছিলো শুধুই আল্লাহর উপর। মু’মিনদের ভেতরে এমন লোকও আছেন, যারা কসম খেলে আল্লাহ তা পূরণ করেই দেন! নিজেদের নিয়ে কথা বললেও তা সত্যে পরিণত হয়ে যায়!

رَبِّ أَشَعْتُ أَغْبِرُ مَلْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

এমন কত্তো মানুষ আছে, চুল যার উস্কুখুস্কু, পোশাক যার জীর্ণবর্ণহীন, (হাত পাতলে) যাকে মানুষ (ধাক্কা দিয়ে) দরোজায় ফেলে দেয়, সে-ই যখন আল্লাহর নামে কসম করে (কিছু বলে), আল্লাহ তা ফিরিয়ে দেন না—কবুল করে নেন—বাস্তবায়ন করে দেখান!¹

সুতরাং হযরত আনাস ইবনে নদরের এই কসম কি বৃথা যেতে পারে? ... চলো দেখি সামনে কী ঘটে!

চার.

হ্যাঁ, এখন অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষা হযরত আনাসের সামনে; কখন আসবে সেই মহালগ্ন। ব্যাকুল হয়ে আছেন হযরত আনাস।

কখন আসবে বীরত্ব প্রকাশের সেই দিন?
যেদিন তাঁর রব খুশি হবেন তাঁর বীরত্বগাথা দেখে?!
তাঁর মন শান্ত হবে বদরে অনুপস্থিতির আফসোস থেকে মুক্ত হয়ে?!
না, আনাসের কিছুই ভালো লাগে না।
খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না।
পরিবার-পরিজনের ছায়া ও মায়াও ভালো লাগে না!
বন্ধুদের সাথে বসতেও ভালো লাগে না!
ভালো না লাগার এ কষ্টপ্রহর কখন কাটবে?!

পাঁচ.

পরাজয়ের দগদগে ঘা নিয়ে বদর থেকে ফিরে এলো মুশরিকরা।
শীর্ষসারির সত্তর নেতা গায়েব! আটক হয়েছে সত্তরজন। মক্কায়
এসে তাদের ভালো লাগে না। রাতে তাদের ঘুমও হয় না। নেতা ও
স্বজন-হারানোর দুঃখ-বেদনা চেপে ধরে রাখে তাদের নিঃশ্বাস।
ক্ষত-বিক্ষত করে চলে মন-মানস সারাবেলা।
ওদের সামনে পৃথিবী আছে, কিন্তু ভীষণ সঙ্কুচিত।
ওদের সামনে পৃথিবী এখন শুধুই ছোপ ছোপ অন্ধকার।
ঘর থেকে বের হলে ওদের মাথা আর আগের মতো উঁচু থাকে না।
বদরের পরাজয় ওদের দর্প ও দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছে।
কী লজ্জা এসে ওদের কান ঢলতে থাকে, যখন শোনে- হায় হায়,
তিনশো তেরো কেমন করে হারিয়ে দিলো এক হাজারকে?!!
আশ্চর্য!! কোন মরুর কোন বালির তলে তলিয়ে গেলো ওদের
শৌর্য-বীর্য?!! ওরা কি কাপুরুষ হয়ে গেলো?!
এ পরাজয়ের খবর সবখানে ছড়িয়ে পড়লো।
এ গোত্রে সে গোত্রে মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো- ছি ছি .. রি
রি।
হায়! হায়! লজ্জার বদরকে যদি ওরা লুকিয়ে ফেলতে পারতো!
বদরের পরাজয়কে যদি ওরা ঢেকে ফেলতে পারতো!!
আবু জেহেল নেই! চিরতরে শেষ!!

উতবা-শায়বা আর কখনো কথা বলবে না! চিরনীরব!!
এ কথা কেমনে ওরা লুকিয়ে রাখবে? ...

সামনে আসছে হজ-মওসুম। মানুষের সামনে পরাজিত এই ছিন্নভিন্ন
কুরাইশ কেমনে মুখ দেখাবে?

লজ্জায় অনুশোচনায় কোথায় তারা মুখ লুকাবে?

মিনায় গিয়ে কোন্ মুখে এখন তারা আত্মবড়াই করবে?

শৌর্যগাথা গাইবে?!

মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের সম্পর্কেই বা এখন কী বলবে?!

পারবে কি অস্বীকার করতে বদরের ময়দানের শোচনীয় পরাজয়?

পারবে ওদের বিপুল বিজয় ও বীরত্বকে অস্বীকার করতে?!!

কুরাইশ এখন অস্থির, দিশেহারা। ভীষণ কোণঠাসা। এ অবস্থা তো
বেশিদিন চলতে পারে না, দমবন্ধ হয়ে ওরা মারা যাবে তাহলে! এ
অবস্থা থেকে যেকোনো মূল্যে বেরিয়ে আসতে হবে! নিতে হবে
বদরের প্রতিশোধ! বদরের লজ্জা থেকে 'হাত না ধুইলে' আর মুখ
দেখানো যাবে না!

এ-ই এখন একমাত্র সমাধান!

এ-ই এখন বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত!

হয়.

বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ে মক্কার কাফের মুশরিকদের হৃদয়ে যে
ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো, তা থেকে রক্ত পড়া এখনো বন্ধ হয় নি।
মহাসমারোহে বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র ও তিন হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী
নিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ যাত্রা করলো মদীনার দিকে।
এ সংবাদ যথা সময়ে জানতে পারলেন নবীজী। তখন সাহাবায়ে
কেরামকে নিয়ে তিনি এক জরুরী পরামর্শে বসলেন। দু'টি বিষয়ে
নবীজী সাহাবীদের মতামত চাইলেন— মদীনার বাইরে গিয়ে দুশমনকে
প্রতিহত করা হবে না ভেতরে থেকেই।

প্রবীণ সাহাবীরা বললেন—

‘মদীনার ভেতরে থেকেই আমরা কাফেরদের প্রতিহত করবো।’

অপরদিকে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না-পারা একদল তরুণ সাহাবী বললেন—

‘না! আমরা মদীনার বাইরে গিয়েই দুশমনকে প্রতিহত করতে চাই। নইলে দুশমন আমাদেরকে ‘কাপুরুষ’ ভাববে।’

নবীজীর নিজের ইচ্ছে ছিলো ভেতরে থেকেই লড়াই করা। কিন্তু টগবগে তরুণ সাহাবীদের মতই শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করলেন এবং হুজরায় গিয়ে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে এসে বললেন—

‘আমরা মদীনার বাইরে গিয়েই লড়াই করবো’

ইতোমধ্যে তরুণ সাহাবীরা বুঝতে পারলেন নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা। তাই আফসোসের স্বরে বললেন—

‘হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা সবদিক চিন্তা না করেই বাইরে গিয়ে লড়াইয়ের কথা বলেছি। আপনার মতই আমাদের মত।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—

‘আমি যুদ্ধের পোশাক পরে ফেলেছি। এখন সিদ্ধান্ত বদলের কোনো সুযোগ নেই। নবীরা একবার যুদ্ধের পোশাক পরে ফেললে তা আর খুলতে পারেন না।’

সাত.

কুরাইশ বাহিনীর মুকাবিলায় নবীজী এক হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে ওহ্দের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যারা যুদ্ধের অনুপযোগী তাদেরকে ফেরত পাঠানো হলো। পথে ঘটে গেলো আরেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাজপাজরা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বসলো। দল ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে গেলো। এদের সংখ্যা ছিলো তিনশো। তাদের দাবি ছিলো— আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করবো না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কণ্ঠে কৃত্রিম রাগ— আমার মতের কোনো মূল্য নেই? অন্যদের মত শুনবেন শুধু?

এই ঘটনার পর প্রমাণ হয়ে গেলো, কারা প্রকৃত মু’মিন আর কারা

লোক-দেখানো মু'মিন-মুনাফিক। এখন মুসলিম সৈন্যসংখ্যা এসে
দাঁড়ালো সাতশোতে। এর মাঝে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী।

আট.

ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সৈন্যদেরকে কাতারে কাতারে সাজালেন। দু'ভাগে ভাগ করলেন।
এক ভাগের উপর আক্রমণের আর অন্য ভাগের উপর গিরিপথে
দুশমনের আকস্মিক হামলা ঠেকানোর দায়িত্ব পড়লো। সুতরাং
গিরিপথে পঞ্চাশ জন দক্ষ তীরন্দাজ মোতায়ন করা হলো। আবদুল্লাহ
ইবনে জোবায়রের নেতৃত্বে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীকে কঠোরভাবে এই নির্দেশ দিলেন—
'কোনো অবস্থাতেই তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। আমাদের
জয় হোক কিংবা পরাজয়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তোমরা
নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে।'

যুদ্ধের পতাকা তুলে দেওয়া হলো হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের
রা.-এর হাতে। আল্লাহর রাসূল নিজের তলোয়ারটি তুলে দিলেন
হযরত আবু দুজানা রা.-এর হাতে।

* * *

মুসলমানরা তো বীরের জাতি। তাই বীরের বীরত্ব দিয়ে তাঁরা
হামলা করলেন। পাহাড়ের অবিচলতা নিয়ে, পাথরের কঠোরতা
নিয়ে দুশমনের হামলা প্রতিহত করে উল্টো একটা একটা করে
দুশমনকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন জমালয়ে। দেখতে দেখতেই শত্রু
বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারা পিছু হটতে
লাগলো। তীর-তলোয়ার আর অন্যান্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম পেছনে ফেলে
পালিয়ে যেতে লাগলো। একটু পর দেখা গেলো— সব দুশমন
ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। মুসলমানদের আনন্দের কোনো সীমা
রইলো না। তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো ওহুদের
ময়দান। আকাশ-বাতাস। বিজয়ের আনন্দে আল্লাহর দরবারে

কৃতজ্ঞতা আদায় করতে করতে এবার তারা মালে গনিমত জমা করতে লাগলেন।

ওদিকে গিরিপথে পাহারারত তীরন্দাজ বাহিনী যখন দেখলো, দুশমন ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলিম সৈন্যরা সবাই মালে গনিমত জমা করছে, তখন তারা একে অপরকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন— ‘হে সম্প্রদায়, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা কী করবো? চলো মালে গনিমত কুড়াই! চলো, জলদি চলো! এখন তো বিজয়ই আমাদের হাতে এসে গেছে!’ এই বলে তাঁরাও ছুটে এলেন গনিমত সংগ্রহের জন্যে। দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র বার বার তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সতর্কবাণী—

‘কোনো অবস্থাতেই তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। আমাদের জয় হোক কিংবা পরাজয়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত— তোমরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে।’

কিন্তু তাঁরা এই যুক্তি দেখিয়ে সবাই চলে এলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার উদ্দেশ্য ছিলো দুশমন পরাজিত না হলে আমরা যেনো এ স্থান ত্যাগ না করি। এখন তো দুশমন পালিয়ে গেছে। অবশেষে সবাই গিরিপথ ত্যাগ করে চলে গেলেন। শুধু দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে রয়ে গেলেন। একটু পরই নেমে এলো মুসলমানদের উপর মহাপ্রলয়।

নয়.

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পেয়েও গেলেন। তীরন্দাজদেরকে গিরিপথ ছেড়ে চলে যেতে দেখে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন দক্ষ ও কুশলী সমরবিদ। ওহুদ যুদ্ধে তিনি কাফেরদের সঙ্গে ছিলেন।

ঘোড়সওয়ারদের একটি দল নিয়ে তিনি গিরিপথের দিকে দ্রুত

অগ্রসর হলেন এবং তীরন্দাজদের জায়গাটা দখল করে নিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে বাধা দিতে গিয়ে সবাই শাহাদত বরণ করলেন!

এদিকে মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরাও এই আকস্মিক আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। মালে গনিমতের দিক থেকে এবার তাঁদের দৃষ্টি গেলো কাফেরদের জবরদস্ত হামলার দিকে। কিন্তু কুরাইশ বাহিনীর হাতে তাঁরা বিপর্যস্ত হতে লাগলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও গুরুতর আহত হলেন। তাঁর চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তাঁর ডানদিকের মাড়ির নিচের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো। শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চেহারার ডানদিকে চোখের নিচে বিঁধে গেলো। আল্লাহর রাসূলের দিকে ছোঁড়া পাথরের আঘাতে আল্লাহর রাসূল পড়ে গেলেন একটি গর্তে। হযরত আলী তাঁকে টেনে তুললেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলকে ঘিরে ধরলো। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সাহাবীরা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ চলে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছে অটল-অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলেন তখনও দশজন সাহাবী। তাঁরা একে একে সবাই লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত আবু দোজানা রা. নিজের পিঠ পেতে আল্লাহর রাসূলকে তীরবৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজেই রাসূলকে তীরবৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজেই হয়ে গেলেন ঢাল। তীর এসে বিঁধছিলো তাঁর পিঠে, তবুও তিনি অনড়! এভাবে ঢাল হয়ে গেলেন হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা.-তাঁর হাতে এসে বিঁধতে লাগলো একের পর এক তীর! একপর্যায়ে তাঁর হাতটা অবশ্যই হয়ে গেলো!

আল্লাহু আকবার!

হে আবু দুজানা, কী মোবারক পিঠ তোমার!

হে তালহা, কী শ্রেষ্ঠ বর্ম তোমার এই হাত দু'টি!!

আল্লাহর রাসূল একটু উপরে উঠে একটা পাথরখণ্ডে বসতে চাইলেন। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে গেছেন! পারলেন না উঠতে! তখন হযরত তালহা 'সিঁড়ি' হয়ে গেলেন! এক ধাপের সিঁড়ি! তিনি বসে গেলেন! তখন আল্লাহর রাসূল তাঁর পিঠে পা রেখে উপরে উঠে গেলেন সহজেই!

আল্লাহ্ আকবার!

কী সুন্দর বাহন!

কী শ্রেষ্ঠ বাহক!

* * *

উম্মে ইমরাহ নামের এক মহিলা সাহাবী এই নাজুক অবস্থা দেখলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভুলে গেলেন তিনি নিজের আসল দায়িত্বের কথা। পানি পান করানোর কাজ ফেলে ছুটে এলেন তিনি ঝলসানো তলোয়ার হাতে। অন্যান্য সাহাবীদের মতো তিনিও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে দুশমনের হামলা প্রতিহত করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ঝলসে ওঠা তলোয়ারে এক মুশরিক নিহতও হলো।

দশ.

ওই দু'টি কড়া এখন কে বের করবেন? খুব কষ্ট হচ্ছিলো প্রিয় রাসূলের! হযরত আবু বকর তা টেনে বের করতে চাইলেন! কিন্তু আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. তাঁকে থামিয়ে নিজেই তা বের করতে চাইলেন! আস্তে আস্তে মাড়ির দাঁত দিয়ে তিনি একটি কড়া বের করে ফেললেন! কিন্তু আবু উবায়দার নিচের মাড়ির একটি দাঁত পড়ে গেলো! আবু বকর দ্বিতীয়বার এগিয়ে এলেন! এবারও তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অপরটিও আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ বের করে আনলেন! এবারও তাঁর আরেকটি দাঁত পড়ে গেলো! নবীকে কড়ার কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে উৎসর্গ করে দিলেন তিনি নিজের দু' দু'টি দাঁত!

হে আবু উবায়দাহ, অমন দাঁত পৃথিবীতে আর কার আছে, যা

‘শহীদ’ হয়েছে নবীকে কষ্টমুক্ত করতে?!

কী মুবারক এই দাঁত!

কী দামি এই দাঁত!!

না-জানি আপনার দাঁতহীন মুখের হাসিটি কতো সুন্দর ছিলো!

নিশ্চয়ই আগে হাসলে আপনাকে যেমন সুন্দর লাগতো, দাঁত পড়ার পরের হাসি সুন্দর ছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি! ইতিহাস তো তা-ই বলে!!

এগারো.

আল্লাহর রাসূলের গাল বেয়ে বেয়ে রক্ত ঝরছিলো। হযরত মালিক ইবনে সিনান দ্রুত সামনে বেড়ে তা চুষে নিলেন! তাকে তখন বলা হলো, ফেলে দিন! তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! কক্খনো আমি তা ফেলবো না!

বারো.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু-বেষ্টনীর ভেতরে। তাঁকে পিঠ পেতে .. হাত পেতে .. তীর ছুঁড়ে রক্ষা করছেন সাত আনসারী সাহাবী এবং দুই মুহাজির সাহাবী! এক পর্যায়ে আক্রমণ যখন তীব্র হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ‘যে দুশমনকে আমার কাছ থেকে দূরে হটিয়ে দিতে পারবে, তার জন্যে জান্নাত!’ তখন এক আনসারী সাহাবী এগিয়ে গেলেন লড়তে। লড়তে লড়তে বিলিয়ে দিলেন জীবন!

আবার মুশরিকদের তীব্র আক্রমণ। আবার আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা, ‘কে ওদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে হটিয়ে দেবে? তার জন্যে জান্নাত! সে হবে জান্নাতে আমার সঙ্গী! এভাবে একে একে সাতজন আনসারী সাহাবী আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিলেন, হাসতে হাসতে। হযরত আনাস ইবনে নদর তখনও অটল-অবিচল। লড়ে যাচ্ছেন

মুশরিকদের সাথে, সীমাহীন অকুতোভয়। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ, এরা যা করলেন (অর্থাৎ মুসলিম সৈন্যরা), আমি আপনার কাছে সে জন্যে ওয়র পেশ করছি! আর ওরা যা করলো (অর্থাৎ কাফের মুশরিকরা), আমি তা থেকে মুক্ত!

হযরত আনাস ইবনে নদর রা. দেখলেন একদল মুসলিম সৈন্য হতাশচিত্তে বসে আছেন। তিনি জানতে চাইলেন, অমন করে তোমরা এখানে বসে আছো যে! তাদের কণ্ঠে জবাব এলো, আল্লাহর রাসূল 'নিহত' হয়েছেন, আমরা এখন কী আর লড়াই করবো!

জবাবে হযরত আনাস বললেন, যে পথে আল্লাহর রাসূল জীবন 'বিলিয়ে' দিয়েছেন, সে পথে তোমরাও কেনো নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে না?! কী করবে তাঁর চলে যাওয়ার পর বেঁচে থেকে?! একটু পর হযরত আনাস ইবনে নদরের দেখা হলো হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সাথে। তখন হযরত আনাস ইবনে নদর বললেন এক অদ্ভুত কথা! বললেন, মু'আয! বিশ্বাস করো, আমি ওহুদের কাছে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি!!

তেরো.

জান্নাতের ঘ্রাণ যাঁর নাকে এসে লাগে এই দুনিয়াতে, তিনি কি আর দুনিয়ায় 'পড়ে থাকতে' চান?! চাইতে পারেন কি?! হযরত আনাস ইবনে নদর রা.ও এই দুনিয়াতে পড়ে থাকতে চাইলেন না! তিনি লড়াই শুরু করলেন! লড়তে লড়তে জান্নাতের পথের সব বাধা একে একে দূর করতে লাগলেন! ঝলসে উঠলো তাঁর বীর তলোয়ার! আঘাতে আঘাতে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো! নিজেও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে লাগলেন! লালে লাল হয়ে উঠলো তাঁর পরনের সবকিছু! এই মহাবীর বীরত্বের ঝলকে ঝলকে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে চলে গেলেন জান্নাতে! ওই জান্নাতে, যে জান্নাতের ঘ্রাণ নাকে এসে লেগেছিলো ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে! শাহাদতের পর দেখা দেখা গেলো, তাঁর শরীরের আঘাত গুনতে অনেক সময় লাগলো! আশিটিরও উপরে আঘাত!! তীরের আঘাত!

বর্ষার আঘাত! তলোয়ারের আঘাত!! প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতে
পারছিলেন না! মুশরিকরা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে!
তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে রেখে গেছে! চোখ নেই! নাক নেই!
কান নেই! বুক হয়ে আছে এফোঁড়-ওফোঁড়!! অবশেষে তাঁর বোন
এসে তাঁকে শনাক্ত করলেন, হাতের আঙুলের মাথা দেখে।

প্রিয় আনাস, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

তোমার মতো এমন মানুষ কেনো বেশি বেশি হয় না?

তোমার মতো বীর হতে এবং বীরত্ব প্রদর্শন করতে কেনো এখন
কোনো বীর আমরা খুঁজে পাই না?!



শূলে চড়ানো খোঁবায়ব রা.

এক.

সাহাবায়ে কেরামের জীবন-অন্যরকম জীবন। দিনেরবেলা ঘোড়সওয়ার
আর রাতেরবেলা তাহাজ্জুদগুজার। ব্যবসা ও কৃষির ময়দানেও
অগ্রগামী। অন্য পেশাতেও তাঁদের কোনো লজ্জা নেই। কখনো
কাপড় বোনা। কখনো সেলাই করা। কখনো হাতে তুলে নেন
লোহা। কখনো হাতুড়ি। চামড়াশিল্পেও প্রয়োজনে উপস্থিত।

সাহাবায়ে কেরাম সব ময়দানে আমাদের আদর্শ।

তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার।

তাঁরা ছিলেন ইলমে নববীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র।

তাঁরা ছিলেন আদর্শ ব্যবসায়ী।

তাঁরা ছিলেন ঘামঝরা শ্রম দিয়ে ফসলের মাঠে সোনা-ফলানো কৃষক।

তাঁরা ছিলেন আরো নানান পেশায় আদর্শ পুরুষ।

কিন্তু বলতে পারো, সবার আগে তাঁরা কী ছিলেন?

সবার আগে তাঁরা ছিলেন মুসলমান।

সবার পরেও তাঁরা ছিলেন মুসলমান।

তাঁরা ছিলেন আগা-গোড়া মুসলমান।

তাঁরা ছিলেন ষোলো আনা মুসলমান।

না, তাঁদের জীবন অস্বাভাবিক ছিলো না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা চলা-ফেরা করতেন। খাওয়া-দাওয়া করতেন। জনতার সাথে খুব মিশতেন। কথা বলতেন। হাসির সময় হাসতেন। কান্না এলে কাঁদতেনও। কিন্তু সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিলো— আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। দীনকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা মনে করতেন— দীন ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে। দীন ঠিক না থাকলে কিছুই ঠিক থাকে না।

কেনো তাঁরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতেন? আল্লাহর ইবাদত করতেন? কেননা আল্লাহ শুধু তাঁর ইবাদতের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদত করার জন্যে। [যারিয়াত : ৫৬]

তাঁরা ইলম তলব করতেন—অন্বেষণ করতেন। কেননা তাঁরা নবীর মুখে শুনেছেন এই আয়াত। হৃদয় দিয়ে করেছেন অনুভব।

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এগুলো বোঝে। [আনকাবুত : ৪৩]
তাঁরা আরো শুনেছেন এই আয়াত—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

‘মানুষের ভেতরে আল্লাহকে ভয় পায় শুধুই জ্ঞানীরা। [ফাতির : ২৮]
ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, বিভিন্ন পেশায় এই যে তাঁদের ব্যস্ততা, সে-ও নিজের পক্ষ থেকে কিছুই নয়। বরং তাঁদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে এই আয়াত—

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

‘নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করো।’ [জুমআ : ১০]

তাই বলে রিযিকের পেছনেই কেবল ছুটে চলা? না!

যখন আসে তাঁদের কানে এই আওয়াজ- এই, কোথায় সব তোমরা? যাবে না অমন জান্নাতের কাছে, আকাশ-পৃথিবী ব্যাপী যার ব্যপ্তি? অথবা কুরআনের এই চিরআহ্বান-

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

‘আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাও (জিহাদে)! [তাওবা : ৩৮]
তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, বিভিন্ন পেশা- সব ছেড়ে তাঁরা ছুটে যেতেন আল্লাহর পথে লড়তে-জিহাদের ময়দানে। না, তখন কোনো কিছুর মায়া তাঁদের পথ আটকে দাঁড়াতো না। গতিরোধ করতো না। পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা পেছনে পড়ে থাকতো। ধন-সম্পদ ও দুনিয়া-বিলাসও তাঁদের কোনো সাড়া পেতো না। স্বজন-স্বদেশ ও বাগান-বাড়ি- সব চাপা পড়ে যেতো তাঁদের জিহাদী চেতনা ও দীনি গায়রতের নিচে।

এমন কেনো হবে না? কেনো তাঁরা জিহাদের ডাকে অমন ব্যাকুল হয়ে .. সব ভুলে সাড়া দেবেন না? প্রিয় নবীর মুখে যখন শোনের কখনো এই ঘোষণা-

الْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

আল্লাহর পথে জিহাদ করে সকাল কাটানো কিংবা এক বিকেল কাটানো (মানে কি জানো?!) যেনো পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা আছে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ!

আবার কখনো এই মিষ্টি হাতছানি-

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَعْرُوزَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَعْرُوزَ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَعْرُوزَ فَأُقْتَلَ.

কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার জীবন, আমার খু-উ-ব ইচ্ছে হয় আল্লাহর পথে লড়াই করে করে মরে যেতে! (আবার জীবন পেলে) আবার লড়াই করে করে মরে যেতে! এভাবে আবার লড়াই করে করে মরে যেতে!!

আবার কখনো এই সুসংবাদ-

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.

তলোয়ারের ছায়াতলেই জান্নাতের খোলা খোলা সব দরোজা!
إِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَواتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا.
আল্লাহর পথে এই-যে তোমাদের সময় কাটানো, তা কতো উত্তম
জানো? ঘরে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়েও উত্তম!!

দুই.

হ্যাঁ, এমনই প্রিয়নবীর প্রিয় সাহাবীদের জীবন। সবই করতেন তাঁরা
অন্য মানুষের মতো। চলতেন ফিরতেন খেতেন এবং
ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব পেশায় সময় দিতেন। কিন্তু সবার আগে
আল্লাহকে সময় দিতেন। আল্লাহর রাসূলকে সময় দিতেন। সবার
আগে আল্লাহর ডাকে এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিতেন।
এমনই একটি ঘটনা এখন তোমাদের সামনে আসছে। চলো ঘটনায়
প্রবেশ করি।

তিন.

আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদের
একটি ছোট দলকে শত্রুর ভূখণ্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।
উদ্দেশ্য- শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে
আসা। আল্লাহর রাসূল ভালো করেই জানতেন যে তিনি এই
দলটিকে পাঠাচ্ছেন শত্রুর এলাকায়। শত্রুরা সুযোগ পেলেই এদের
ক্ষতি করবে। খুব দেখে শুনে আল্লাহর রাসূল এমন দশজন সাহাবীকে
এই বিশেষ অভিযানের জন্যে নির্বাচন করলেন, যারা জীবনকে
ভালোবাসেন না। আবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও অনিহা প্রকাশ
করেন না-অপছন্দ করেন না।

দশজনের এই কাফেলার আমীর বানালেন আল্লাহর রাসূল প্রিয়
সাহাবী আসেম ইবনে সাবেত রা. আলআনসারীকে।

চার.

রওয়ানা হওয়ার আগে সবাই পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব- সবাইকে

বিদায় জানালেন ভেজা চোখে! যাচ্ছেন তো দুশমনের এলাকায়!
ফেরা-না-ফেরা অনিশ্চিত! মুশরিকরা ওত পেতে আছে!
পথচলার আগে ছলছল চোখে তাকিয়ে তাঁরা বললেন সবার
উদ্দেশে—

বিদায় প্রিয়!

দেখা হবে একদিন!

কেয়ামতের দিন!!

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে যেতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন
গন্তব্যে—‘হাদআ’য়।’

পাঁচ.

‘হাদআ’ এলাকার এক লোক তাঁদের অবস্থান টের পেয়ে গেলো।
সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানাতে সে হতুদন্ত হয়ে ছুটে গেলো বনু
লিহইয়ানের কাছে। গিয়ে বললো, এই, খবর রাখো কিছু?! হাদআয়
একদল মুসলমান এসে নেমেছে! জবাবে বনু লিহইয়ান বললো, না
তো! এমন কিছু তো আমরা শুনি নি! লোকটি বললো, ওরা
হাদআতেই আছে! আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি! যা করার
জলদি করো! ওরা মনে হচ্ছে বিপদজনক।

বনু লিহইয়ান লোকটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললো, আচ্ছা বলো
তো, ওরা কয়জন!

আমার মনে হয় দশজনের বেশি হবে না!

তাহলে তো কমপক্ষে একশো লোক নিয়ে যেতে হবে! মুসলমানরা
একাই দশজনের মুকাবিলা করতে পারে! ওদের দশজন। আমাদের
একশো জন এক সমান। ওদের কুরআনেও এমন আছে, জানো?

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۖ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

১ উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম।

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি মাত্র বিশজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তাহলে তারা দু'শো জনের উপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশো জন ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তাহলে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়লাভ করবে, এ কারণে যে, তারা সত্যের জ্ঞান রাখে না।
[আনফাল : ৬৫]

বদরের কথা ভুলে গেছো? দেখো নি, মাত্র তিনশো তেরোজন কেমন করে পরাজিত করেছিলো মক্কার অশ্রুসজ্জিত হাজারের বাহিনীকে?! আমাদের নেতৃস্থানীয়রা সবাই সেদিন নিহত হয়েছিলো! আল্লাহর কসম! কুরাইশ নেতা আবু ইকরামা (আবু জেহেল)-এর কথা আমরা ভুলতে পারবো না! আবুল ওয়ালিদ (উতবা বিন রবিআ) ও তার ছেলে- অমন বীরপুরুষ আর কোথায় পাবো আমরা?!
হে বদরে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা, আমরা তোমাদের ভুলবো না!
তোমাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের কর্তব্য!
চলো, এক্ষুনি চলো, বদরের প্রতিশোধ নিতে!!

হয়.

বনু লিহইয়ানের একশো জন যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেলো। ঘোষণা এলো- চলো শত্রুদের ঠিকানায়! চলো হাদআয়! ওখানেই আছে শত্রু! ওখানে গিয়েই আমরা প্রতিশোধ নেবো বদরের!
এরা এগিয়ে চললো চোখে-মুখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। পথে পথে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো জনে জনে, এই, ইয়াসরিব থেকে নাকি আটদশজন লোক এদিকে আশ্রয় নিয়েছে? দেখেছো ওদেরকে? কোনো খবর আছে তোমাদের কাছে? ভালো কথা, নামাযের সময় হলে অবশ্যই ওরা নামায পড়বে! তোমরা কি এমন কাউকে দেখেছো, যে নামায পড়ছিলো? ...
পদচিহ্ন ধরে ধরে বনু লিহইয়ান সামনে বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের টিলায় সাহাবীদেরকে আবিষ্কার করে ফেললো।

তারা সহাস্যে নিজেদের মাঝে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।
যেনো মস্ত এক শিকারের সন্ধান তারা পেয়ে গেছে।
হযরত আসেম যখন টের পেয়ে গেলেন যে, তাদেরকে পেছন থেকে
অনুসরণ করা হচ্ছে, যেকোনো সময় তারা আক্রান্ত হতে পারেন,
নিরাপত্তার জন্যে তখন তিনি এই পাহাড়ের টিলাটিকে বেছে
নিয়েছিলেন।

সাত.

এর মাঝেই দুশমন তাঁদেরকে ঘিরে ফেললো। বললো, যদি কোনো
গোলমাল না করে নেমে আসো, তাহলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-
তোমাদের কাউকেই হত্যা করা হবে না!

কিন্তু হযরত আসেম ইবনে সাবেত আলআনসারী দুশমনের প্রতিশ্রুতি
বিশ্বাস করলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, কাফেরদের প্রতি-
শ্রুতি মিথ্যা। প্রতারণাপূর্ণ। এদের কোনো ওয়াফাদারি নেই।
কোনো আমানতদারি নেই। কোনো কিছুই এদের বিশ্বাসঘাতকতা
ঠেকাতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন এদের এই স্বভাব নিয়ে-

لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِزْمَةً.

‘তারা তোমাদের আত্মীয়তার এবং অঙ্গিকারের মর্যাদা রক্ষা করবে
না।’ [তাওবা : ৮]

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ.

‘নিশ্চয়ই এদের প্রতিশ্রুতি কোনো প্রতিশ্রুতিই না ...।’ [তাওবা : ১২]

এই এরাই তো কিছুদিন আগে আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে
আবেদন করেছিলো- আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠান,
যাঁরা আমাদের দীন শেখাবেন, কুরআন পড়াবেন, সুন্নত শেখাবেন!
আল্লাহর রাসূল তখন তাদের সঙ্গে সত্তর জন আনসারী সাহাবীকে
পাঠিয়েছিলেন, যাঁদের সবাই ছিলেন কুরআনের বিশিষ্ট ক্বারী।

কিছু কী ঘটলো? কাফেররা নিজেদের বসতির সীমানায় পৌঁছার আগেই সবাইকে হত্যা করে ফেলে!!

না, সে কথা আসেম ভুলে যান নি! তাই কোনো কাফেরের কোনো প্রতিশ্রুতিতেই তাঁর বিশ্বাস নেই। এরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। পরকালে বিশ্বাস করে না। এদের সামনে কোনো বাধা নেই, যখন তখন এরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। প্রতিশ্রুতি পূরণে কিছুই এদেরকে প্রেরণা যোগায় না-উদ্বুদ্ধ করে না!

আসেম পরিষ্কার ভাষায় বললেন, হে সম্প্রদায়, আমি কোনো কাফেরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করি না!

এরপর আসেম বলে উঠলেন (আকাশের দিকে তাকিয়ে)- হে আল্লাহ! আমাদের এই অবস্থা তোমার নবীকে অবহিত করো!

আট.

আসেমের কথায় কাফেররা চটে গেলো। ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো। তারা তীর ছুঁড়তে লাগলো। তীর তো নয়, তীরবৃষ্টি! হযরত আসেম শহীদ হয়ে গেলেন! তাঁর সাথে আরো ছয়জন শহীদ হয়ে গেলেন!!

হযরত আসেম নতিস্বীকার করেন নি। হযরত আসেম কাফেরদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন নি। আল্লাহ এর বদলা দিলেন। শহীদ হওয়ার পর হযরত আসেম আল্লাহর 'নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি'তে চলে গেলেন! আর আল্লাহ যার নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁর গায়ে হাত দেয়- কার এমন সাহস ও ক্ষমতা? ... আরেকটু ভেঙে বলি- দেখো আল্লাহর কী কুদরতি সুরক্ষা! হযরত আসেমের লাশ জমিনে পড়তে দেরি কিছু একঝাঁক মৌমাছির ছুটে এসে চাক-বেঁধে তাঁকে শীতল ছায়া দিতে একটুও দেরি হলো না!

শুধু কি ছায়া?

মৌমাছি তাঁর লাশের বিশ্বস্ত প্রহরীও হয়ে গেলো!

কেউ তাঁর লাশের কাছে আসতে পারছে না!

আসতে চাইলেই মৌমাছির ঝাঁক এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতো!

এই গল্প আসছে এই আরেকটু সামনে!

নয়.

হযরত আসেম এবং তাঁর ছয় সঙ্গী শহীদ। অবশিষ্ট আছেন আর তিনজন। তাঁরা কী করবেন? লড়ে লড়ে শহীদ হয়ে যাবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আবার ফিরে যাই হযরত আসেমের আলোচনায়।

হযরত আসেম ইবনে সাবেত আলআনসারী বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে এই মহান বীর হত্যা করেছিলেন বড় এক কুরাইশ সরদারকে। তাই হযরত আসেমের এই হত্যার সংবাদ পেয়ে ওই কুরাইশ নেতার আত্মীয়রা সীমাহীন উল্লসিত হলো এবং আসেম-যে সত্যি সত্যি নিহত হয়েছে- তা নিজের চোখে দেখার জন্যে একজন লোক তারা মক্কা থেকে পাঠিয়ে দিলো। আসার সময় তারা লোকটিকে বলে দিলো, আসেমের শরীরের কোনো অংশ কেটে নিয়ে আসবে! তোমার মতো আমরাও এখানে বসে নিজের চোখে তাঁর হত্যা-প্রমাণ দেখতে চাই!

কিন্তু বন্ধু, তোমাকে আগেই আমরা বলেছি, এখন আবার বলছি- আল্লাহ কি তাঁকে নিজের নিরাপত্তা হেফাজতে নেন নি?

তিনি কি মৌমাছি দিয়ে তাঁকে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন না?

তাহলে বলো, এই নাপাক মুশরিকরা কেমন করে তাঁর দেহ বিকৃত করতে পারে? ... কেমন করে তাঁর দেহ থেকে কেটে-কেটে কোনো অংশ নিয়ে যেতে পারে?

ওই লোকটা হযরত আসেমকে কী করে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা থেকে নিজের আয়ত্বে ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাঁর দেহ বিকৃত করতে পারে? ...

অসম্ভব! অসম্ভব!!

পারবে না! পারবে না!!

* * *

লোকটা এলো মক্কা থেকে। দেখলো দূরে দাঁড়িয়ে হযরত আসেমকে। ব্যস, এ পর্যন্তই! কাছে যাওয়ার সাহস পেলো না!

কেননা দূর থেকেই সে দেখতে পেলো- ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি
হযরত আসেমকে পাহারা দিচ্ছে! ছায়া দিচ্ছে! আর ভীতিকর শব্দ
করছে!! বোঝাই যাচ্ছে- কাছে গেলে মৌমাছির তর উপর হামলে
পড়বে! হুল ফোটাবে!! মৌমাছির হুল-কামড় সহিতে পারে- কার
আছে অমন বুকের পাটা?!

আসেমের কাছে যাওয়ার কল্পনা করতেই লোকটার অন্তর ভয়ে
কাঁপতে লাগলো। অন্য কেউ-ও তাঁর কাছঘেষার সাহস পেলো না!
না, শাহাদতের পর কেউ আসেমকে স্পর্শ করার সাহস পেলো না!
না মক্কার ওই লোকটা, না বনু লিহইয়ানের কোনো গাদ্দার!

বন্ধু, কতো ভালো হয় না- আমরা সবাই যদি মানুষের সুরক্ষা
প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর সুরক্ষায় চলে যাই?! আল্লাহর সুরক্ষাই
একমাত্র সুরক্ষা! আল্লাহর সুরক্ষায় চলে গেলে কে আমাদেরকে আর
কষ্ট দেয়? নির্যাতন করে?! কিন্তু মুশকিল হলো, আমরা যে হযরত
আসেমের মতো হতে পারি না! তাঁর মতো যে প্রিয়নবীকে
ভালোবাসতে পারি না! তাঁর আরো কতো গুণ ছিলো, সেসব কি
আমরা অর্জন করতে পেরেছি? ...

আবার ফিরে যাই আগের কথায়।

দশ.

এখন এই তিনজন কী করবেন? এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে
আল্লাহর রাসূলকে গিয়ে জানাতে হবে। যেকোনো উপায়ে কাউকে
না কাউকে যেতে হবে মদীনায়। প্রিয় নবী তো এই উদ্দেশ্যেই
তাঁদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন! সবাই শহীদ হয়ে গেলে কে নবীকে
গিয়ে 'চোখে দেখা সব' জানাবে?

হযরত আসেম ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর ইচ্ছায় চলে গেছেন। শহীদ
হয়ে গেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, বদলাও পাবেন। সবাই সবার
কাজের বদলা পাবেন। সবাই তো আল্লাহর সন্তুষ্টিই চেয়েছেন!

সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করবেন!
তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন- তারা আর লড়বেন না! বরং ওদের

আশ্বাসের উপর বিশ্বাস করে নিচে নেমে যাবেন! তারপর যেকোনো মূল্যে মদীনায় যাওয়ার পথ খুঁজে নেবেন! অথবা আল্লাহ ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে।

এগারো.

হযরত খোবায়ব ইবনে আদি রা., যায়দ ইবনে দাসিন্নাহ রা. এবং তাঁদের অপর সঙ্গীটি ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন। নামতেই বনু লিহইয়ানের লোকেরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেললো। তারপর ধনুকের তার দিয়ে বেঁধে ফেললো।

নিরাপত্তার আশ্বাস থেকে এতো দ্রুত তারা সরে যাবে- ভাবেন নি তিন সাহাবী! তৃতীয় জন তো ক্ষেপেই গেলেন! বললেন, তোমাদের গাদ্দারি তাহলে শুরু হয়ে গেছে! এটা তোমাদের প্রথম গাদ্দারি! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না! আমি এদের -এই শহীদদের- পাশে বসেই সান্ত্বনা খুঁজবো! আমি যাবো না, যাবো না!! কী করবে করো!!

কিন্তু দুশমন তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো, জোর করে! সঙ্গে যেতে রাজি করানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তাঁর একই কথা, যাবো না! তখন তারা তাঁকেও মেরে ফেললো!

ছয় শহীদের সাথে যোগ হলেন আরেক শহীদ! শেষ তিনজনের মধ্যে বাকি আছেন আর দুইজন! এবার এই দুইজনকেই নিয়ে গেলো মক্কার বাজারে! তারপর বিক্রি করে দিলো!!

বারো.

মক্কার বাজারে কে কিনেছিলো তাঁদেরকে? বনু লিহইয়ান আক্রোশ বশত দু'জনকে দু' জায়গায় বিক্রি করেছিলো। আরেকটু খুলে বলি- হযরত খোবায়ব ইবনে আদি রা. বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। বনু হারিস যখন জানতে পারলো খোবায়ব এখন মক্কায়। বাজারে নিয়ে এসেছে বনু লিহইয়ান বিক্রি করতে, তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলো এবং

খোবায়বকে ক্রয় করে নিলো- নিজেদের হাতে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে।

অপরদিকে যায়দ ইবনে দাসিন্নাহকে ক্রয় করলো সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। বদরের যুদ্ধে করুণভাবে নিহত হয় উমাইয়া ইবনে খালফ হযরত যায়দ ইবনে দাসিন্নাহর হাতে।

তেরো.

হযরত খোবায়ব ইবনে আদি রা. এখন বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন বনু হারিসের হাতে। তিনি জানেন না কবে তাঁকে হত্যা করা হবে। শুধু জানেন তাঁকে হত্যা করা হবেই যেকোনো দিন-খুব শিগগির।

একদিন হযরত খোবায়ব একটা খুর সংগ্রহ করলেন। ধার নিলেন। অল্প সময়ের জন্যে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেবেন একটু। বলা যায় না কখন যেতে হবে শূলের বলি হতে। হযরত খোবায়ব রা.-এর হাতে ধারালো ওই খুরটা। এর মাঝেই তাঁর কাছে ছোট ছোট পায়ে এসে হাজির হলো ছোট্ট একটি মেয়ে, বনু হারিসেরই। মা ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। শিশুটি চলে এসেছে একেবারে খুর-হাতে বসে-থাকা শত্রুর কাছে। শুধু কি কাছে? একেবারে তাঁর কোলে এসে বসে গেলো। শিশুরা তো আর শত্রু-মিত্র বোঝে না। যাকে ভালো লাগে তার কাছেই ছুটে যায়। এদিকে খোবায়ব আজ কতদিন নিজেদের বাচ্চাদেরকে দেখেন না, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন না। তাই মেয়েটিকে কাছে পেয়ে চলে গেছেন একেবারে পরিবারের পরিবেশে- কল্পনায়। কোলে বসিয়ে মেয়েটিকে কতো কী ভাবছেন খোবায়ব! হাতে খুর। কল্পনায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে মিষ্টি মিষ্টি স্মৃতি।

হযরত খোবায়বের মিষ্টি পরশে ছোট্ট মেয়েটি বেশ বসে আছে তাঁর কোলে। খোবায়ব শিশুদেরকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর মন ছিলো কোমল, স্নিগ্ধ। ঠিক শিশু-মনের মতোই। এমন তো হবেই! তিনি যে মুহাম্মদী মাদরাসার আদর্শ ছাত্র! তিনি আল্লাহর রাসূলকে

দেখেছেন শিশুদেরকে আদর করতে, চুমু খেতে। তাই তিনিও প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো শিশুদেরকে আদর করেন। চুমু খান। নিষ্ঠুরতা? নবীর মাদরাসার কোনো ছাত্রের কাছে অকল্পনীয়!

এদিকে একটু পর শিশুটির মা যখন দেখলেন শিশুটি খোবায়বের কোলে আর খোবায়ব ধরে আছে ধারালো খুরটি, মায়ের অন্তরাত্মা ভয়ে শংকায় কেঁপে উঠলো!

কী কলজে-কাঁপানো ভয়ানক দৃশ্য!

শিশুটি বসে আছে শত্রুর কোলে!

শত্রুর হাতে ধারালো খুর!

শত্রুর সামনে মৃত্যু!

আগামীকালের সূর্যোদয়ই হয়তো তার জীবনের শেষ সূর্যোদয়!

এ যে শত্রুর জন্যে এক মহাসুযোগ!

মরার আগে শিশুটিকে মেরে এখন সে প্রতিশোধ নেবে! নেবেই!!

মায়ের মন বার বার কেঁপে উঠতে লাগলো রাজ্যের আশংকায়!

চৌদ্দ.

আহা বেচারি! কোনো ধারণাই নেই তার শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ মাদরাসার এই আদর্শ ছাত্রের ব্যাপারে!

সে জানে না মুমিন কাকে বলে!

মুমিনের ওয়াফাদারি কী!

মুমিনের দয়া-মায়া-মহানুভবতার কিছুই বুঝি দেখে নি সে!

শোনো হে অবলা নারী,

মুমিন নির্দোষ মানুষ হত্যা করতে পারে না!

শিশু-কিশোর হত্যা তো কক্খনো না! অকল্পনীয়!!

যুদ্ধের উত্তাল মুহূর্তেও তো শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ-নারীর উপর মুসলমানের তলোয়ার ওঠে না!

এখানে এই ঘরের ভেতরে কেমনে এই শিশুর উপর খোবায়বের খুর উঠবে?

খোবায়ব দেখলেন- মা রাজ্যের বিচলন নিয়ে তাকিয়ে আছে 'অসহায়' শিশুকন্যাটির দিকে! খোবায়ব আর নীরব থাকলেন না। মায়ের ভয় ও বিচলন দূর করা দরকার। তিনি তাকালেন মায়ের দিকে, বললেন- আপনি ভয় পচ্ছেন?! আমি ওকে মেরে ফেলবো?! কক্খনো না! ও আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ!!

পনেরো.

হযরত খোবায়ব রা. ছিলেন শত্রুর হাতে বন্দি। ঠিকমতো খেতে পেতেন না। ওরা ঠিকমতো খাবার দিতো না-বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সামান্য খাবার ছাড়া। না-খেয়ে মারা গেলে কাকে হত্যা করবে ওরা? কার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে? অদ্ভুত সব অংক মেলায় এই শত্রুরা! কিন্তু এই অল্প ও সামান্য খাবারে তো খোবায়বের পেট ভরে না! শুধু ক্ষুধাটা আরো বুঝি বেড়ে যায়! আরো বেসামাল হয়ে যায়!! অনেক কষ্ট হয়! ইশ, ভাবলেই চোখ ছলছল করে ওঠে! তাই না? ...

শোনো, খোবায়ব আল্লাহর জন্যে সব করেছেন। সব করছেন। বাড়ি ছেড়েছেন আল্লাহর জন্যে।

পরিবার-পরিজন ছেড়ে এসেছেন আল্লাহর জন্যে!

এই যে ক্ষুধায় পিপাসায় কষ্ট পাওয়া, সেও আল্লাহর জন্যে!

খোবায়ব সবই করছেন শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে।

তাহলে আল্লাহ কি খোবায়কে ভুলে যেতে পারেন, বলো?

না! না!! অসম্ভব!!

হ্যাঁ, আল্লাহ খোবায়কে ভোলেন নি!

বরং আকাশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মজার মজার খাবার! তাজা তাজা ফল!

আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাকে বদলা দেন এভাবেই!

তিনি শ্রেষ্ঠ বদলাদানকারী!

তিনি জানেন- কে অধিকারী এই বদলা পাবার!

* * *

হযরত খোবায়ব রা. এখন যে পৃথিবীতে বাস করছেন সেই পৃথিবীর

ঠিকানাটা একটু অন্যরকম! তা ঠিক মাটি ও বাতাসের পৃথিবী না!
পার্থিব অনুভব-অনুভূতির জগত থেকে আলাদা!
তিনি এখন ডুব দিয়েছেন রুহ ও আত্মার অপার্থিব জগতে।
এখন অদৃশ্যই তাঁর কাছে দৃশ্যমান!
অদেখা জান্নাতের দৃশ্যচিত্র তাঁর চোখে এখন ঝিলমিল করছে!
আল্লাহর দিদার লাভের মহালগ্ন এখন তাঁকে হাতছানি দিয়ে
ডাকছে!
শাহাদতের লাল শয্যা এখন তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে
অপেক্ষা করছে! জান্নাতের আকাশে সবুজ পাখি হয়ে উড়ে বেড়ানোর
শ্রেষ্ঠ সময়টা খুব বেশি দূরে নয়!
বিদায় হে পার্থিব জীবন!
আর দেখা হবে না কোনোদিন তোমার ক্ষমতা ও দম্ভের সাথে!
তোমার জুলুম-নির্যাতন ও ধ্বংস-তাগুবের সাথে!
ধ্বংস হোক তোমার দম্ভ ও দর্প!
বিদায় নিক পৃথিবী থেকে সব জুলুম!!

ষোলো.

এমন অপার্থিবতার ভেতরে থেকেই একের পর এক নেয়ামত লাভ
করছিলেন হযরত খোবায়ব আল্লাহর পক্ষ থেকে।
আল্লাহ এখন তাঁর মেজবান।
তিনি এখন আল্লাহর মেহমান।
কত্তো খাবার আসে আল্লাহর হুকুমে তাঁর সামনে—
সেই জান্নাত থেকে! আল্লাহর পক্ষ থেকে!
অমন আসমানী মেহমানদারি কী রূপময়, বর্ণময় ও বৈচিত্রময়!! এই
রূপ-বৈচিত্রের কথা বলি কোন্ শব্দের আশ্রয়ে? কোন অলংকারের
ছায়ায় বসে?
তাঁর অবস্থা যেনো পুণ্যবতী মহীয়সী বিবি মারইয়ামের মতো!
মওসুম ছাড়া তাজা-তাজা ফল খেয়ে যিনি বলে গেছেন 'তাঁর
পৃথিবী'র সব বাসিন্দাকে—

আল্লাহর হয়ে যাও! তাহলে আল্লাহও তোমার হয়ে যাবে! আর আল্লাহ তোমার হয়ে গেলে খাবার নিয়ে একটুও ভাবতে হবে না! আকাশের মালিক রং-বেরঙের দস্তুরখান সাজিয়ে-সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন তোমার সামনে! একা-একা খাবে! কেউ দেখে ফেললে বলবে, আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাব রিযিক দান করেন!

খোবায়বের কাছেও মহীয়সী মারইয়ামের মতো বেমওসুমে'র নানান ফল এসে পরিবেশিত হতো! তিনি মজা করে-করে খেতেন! বনু হারিসের সদস্যরা অবাক হয়ে শুধু দেখতো আর ভাবতো—

এ সব কোথেকে আসে?

কেমন করে আসে?

কোন দিক দিয়ে আসে?!

কে দিয়ে দিয়ে যায়?

শৃঙ্খলিত এই বন্দির কাছে?

হারিসের এক মেয়ে বলেন— খোবায়বের মতো অমন শ্রেষ্ঠ বন্দি জীবনে আর দেখি নি! একদিন দেখি কি, সারা মক্কা জুড়ে যে আঙুরের কোনো দেখা নেই, সেই আঙুর খোবায়বের সামনে পড়ে আছে থোকায় থোকায়! তাজা তাজা!! আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এ ফল এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে!!

সতেরো.

কিন্তু এ সব —খোবায়বের মহানুভবতা ও কারামত— দেখেও বনু হারিসের লোকেরা হত্যাচিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো না! এখনো তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ— খোবায়বকে বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না! খোবায়বকে মেরে ফেলতে হবে, হবেই!

আসলে শত্রুতা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। শত্রুর চোখে শত্রুর গুণ শুধু হিংসাই সৃষ্টি করে!

কুফরির এই এক বিপদ!

ভালোকে ভালো বলে না!

মন্দকেও মন্দ বলে না!
অন্ধকারকেই বলে বসে- আলো!
নিজের ঘুণেধরা বিশ্বাসকেই শুধু বলে- ভালো!
এর বাইরে কোনো কিছুকেই এই কাফেররা সহ্য করতে পারে না!
হে আল্লাহ, এদের সুমতি দাও!
দাও তোমার পক্ষ থেকে আলো!

আঠারো.

বনু হারিস হযরত খোবায়ব ইবনে আদি রা.-এর প্রতি কোনো দয়া দেখালো না। রক্তাক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো হারামের বাইরে।

কাফের মুশরিকরা মনে করতো, হারামে কোনো রক্তপাত করা যায় না। অন্যায় ও জুলুম করা যায় না। আশ্চর্য! হারামে যা করা যায় না, তা কি 'হালালে' (হারামের বাইরে) করা যায়? হালাল জায়গায় এমন কেউ নেই কি, যাকে তারা ভয় করে? হালাল স্থানে তাদের এই হত্যাকাণ্ড কেউ কি দেখবে না? এমন তো হতে পারে না- হারামের সংরক্ষিত এলাকায় যা জুলুম তা অন্য জায়গায় জুলুম নয়?! কিন্তু ওই যে আগেই বলেছি- কুফরি মানুষকে বধির করে দেয়!

অন্ধ করে দেয়!

বিবেকশূন্য করে দেয়!

স্বাভাবিক বোধ-বিচার থেকেও বঞ্চিত করে দেয়!

শয়তান এসে ওদের চোখে অন্ধত্ব ঢেলে দেয়!

কানে ঢেলে দেয় বধিরতা!

* * *

হযরত খোবায়ব বুঝতে পারলেন, তাঁর হাতে বেশি সময় নেই! তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন (মনোনিবেশ করলেন)। ওদেরকে বললেন, আমি দু'রাকাত নামায পড়বো-সুযোগ দাও!! ওরা সুযোগ দিলো। তিনি দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষ করে

তিনি বললেন, ইচ্ছে হচ্ছিলো আরো নামায পড়ি! আরো দীর্ঘ করি! আমার রবের সামনে আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি! কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছিলো, তোমরা বলবে— খোবায়ব মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছে! এই যে এখন আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত! এখন কী করতে চাও আমাকে, করো!!

এরপর হযরত খোবায়ব ইবনে আদি রা. আকাশের মালিকের কাছে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। বললেন—

اللهم أحصهم عددا! واقتلهم بددا! ولا تبق منهم أحدا!
'আল্লাহ, এদেরকে গুনে গুনে শেষ করে দাও! একে একে সবগুলিকে! একটাকেও ছাড়বে না!'

তিনি আরো বললেন, আল্লাহ! এখানে তো এমন কেউ নেই, যে আমার সালাম পৌঁছে দেবে প্রিয় রাসুলের কাছে! তুমিই পৌঁছে দাও হে আল্লাহ!

এরপর হযরত খোবায়ব ইবনে আদি আবৃত্তি করলেন সেই ঐতিহাসিক কবিতা পংক্তি, যা আজো রক্তে রক্তে চেতনা জাগায়—

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا ... قبائلهم واسـتـجمعوا كل مجمع
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي ... وما أرسل الأحزاب عند مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ثمـزع
ولست أبالي حين أقتل مسلما ... على أي جنب كان في الله مصرعي
ওরা দলে দলে জমা হয়েছে আমার পাশে! ডেকে ডেকে এনেছে গোত্রের পর গোত্রকে! জমা হতে আর কেউ কি বাকি আছে?

আল্লাহর কাছেই আমি অভিযোগ করছি, কেউ নেই আমার পাশে এই প্রবাসে, কী বিপদ! আহা, আমার মৃত্যু দেখতে জমা হয়েছে কতো মানুষ!

আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত! তিনি ইচ্ছে করলে আমার ছিন্নভিন্ন দুর্বল দেহের টুকরোয় টুকরোয় বরকত ঢেলে দেবেন! না! আমি কোনো পরোয়া করি না মৃত্যুর, যদি থাকি মুসলিম! যেভাবেই হোক আমার মৃত্যু, হোক! শুধু আল্লাহর পথে হলেই হলো!!

হযরত খোবায়ব রা.কে শূলে চড়ানো হলো! তারপর নিষ্কিণ্ত হতে
লাগলো তীর, একের পর এক! যেনো ঝড়ো তীরবৃষ্টি! রক্তময়
খোবায়বকে এভাবে তিলে তিলে ঠেলে দেওয়া হতে লাগলো মৃত্যুর
কোলে!

এ নিষ্ঠুরতা কারো চোখে 'আঁসু আনলো' না!

কেবল নিষ্ঠুর উল্লাস!

বিকৃত আনন্দ প্রকাশ!

উনিশ.

শূলে চড়ানো ওই মহান শহীদ কী সুন্দর!

আল্লাহর পথে এভাবে 'নির্জন নিরাত্মীয়' প্রবাসে কে পারে অমন
করে জীবন বিলিয়ে দিতে?

অপরদিকে কী অসুন্দর ও দৃষ্টিকটু এইসব মানুষের ভিড়!

কী ঘৃণা-কুড়ানো তাদের মুখের হাসি!

ছি ছি! ওদের জন্যে দলা দলা ঘৃণা!!

ওরা কাকে দেখছে কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জানে?

এমন একজন মহান ব্যক্তিকে—

যিনি আল্লাহর জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন!

একটুও পরোয়া করেন নি—

কীভাবে তাঁর মৃত্যু হবে! শূলে চড়িয়ে না অন্যভাবে?!

শুধু ভেবেছেন, এই মৃত্যু কি আল্লাহর পথে? তাহলেই হলো!

আর কিছু লাগবে না!!

না, জীবনে তিনি কখনো খেয়ানত করেন নি।

গাদ্দারি করেন নি।

মিথ্যাও বলেন নি।

শূলে চড়ার পর রক্তাক্ত বিদায়ের একদম শেষবেলায়ও একটু বলেন
নি—

এই, তোমরা আমায় এবার ছেড়ে দাও না!!

এরা কারা তাঁর লাশের পাশে অমন আদিম উল্লাসে মেতে উঠেছে?
কে তিনি-ওরা কি জানে না?
ওরা তাঁর সাথে কী নিষ্ঠুর আচরণ করেছে-জানে না?
কী গাদ্দারি করেছে-জানে না?
তিনি খোবায়ব!
বিশ্বাস করেছিলেন এদের উপর, এরা সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে!
খেয়ানত করেছে!!
এই অবিশ্বসীরা .. এই খেয়ানতকারীরা কোন্ মুখে তাঁর সামনে
দাঁড়িয়ে আছে?
তাঁর ক্ষত-বিক্ষত লাশ নিয়ে অরুচিকর ও অশুদ্ধ আনন্দ করেছে?!
হে অরুচিকর বিকৃত মানুষেরা!
তোমাদের ভারে পৃথিবী পড়েছে চরম অস্বস্তিতে!
তোমরা মানুষ হও!
নইলে বিদেয় হও!!

বিশ.

শূলে থাকা অবস্থায় এই লাশের সাথে সীমাহীন বেয়াদবি করেছে
কাফেররা। তীর ও বর্ষার আঘাতে দেহের চামড়া ছিন্নভিন্ন করে
দিয়েছে। দেহের গোশত পর্যন্ত কেটে কেটে নিয়ে গেছে। শেষ
নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে কেবল কাতরাচ্ছিলেন হযরত খোবায়ব রা।
এই মুহূর্তে কার কথা কার মনে থাকে?
বন্ধু ভুলে যায় বন্ধুকে।
ভাই ভুলে যায় ভাইকে।
মা-বাবাকেও ভুলে যায় মানুষ।
স্ত্রী-পুত্রের কথাও মনে উদয় হয় না!
ঠিক সেই মুহূর্তে নিষ্ঠুর কাফেররা খোবায়বকে ডেকে বললো-
এই, তুমি কি চাও তোমার জায়গায় মুহাম্মদ হোক?!
থায় নিশ্চয় খোবায়বের কানে এ কথা ঝড় তুললো!
তিনি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, অসম্ভব! এ অবস্থায়

তাকে কল্পনা করা তো দূরের কথা, তাঁর পায়ে একটি কাঁটা বিঁধুক-
সে-ও আমি কল্পনা করতে পারি না!!
খোবায়বের কাছে এমন উত্তর শুনে তারা সীমাহীন বিস্মিত হলো!
তারা বিবেকের দংশনে জ্বলতে লাগলো! কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশ
করলো না!

* * *

প্রিয় খোবায়ব! আল্লাহর রহমতে সিক্ত হয়ে চলো যতোদিন আল্লাহ
চান ততোদিনই! নবীপ্রেম আর আল্লাহপ্রেমের যে নজির তুমি রেখে
গেলে অনাগত প্রজন্মের জন্যে, তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া
যাবে কি? জানি না খোবায়ব, আমরা জানি না!



কাবার রবের শপথ— আমি সফল

এক.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত সাহাবীকে পাঠালেন একটি বিশেষ অভিযানে। উদ্দেশ্য কিছু লোককে তাঁর কাছে ডেকে আনা। ইসলামের দিকে তাদেরকে তিনি ডাকবেন—ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন। সত্তরজন বিশিষ্ট সাহাবীর মুবারক কাফেলা এক সময় রওয়ানা দিলেন। এই একজন সদস্য ছিলেন হযরত হারাম ইবনে মুলহান রা.। তিনি শহীদ হয়েছিলেন এই অভিযানে। তাঁকে বর্শাঘাতে শহীদ করেছিলো জাবার ইবনে সালমা।

বদর-ওহুদে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হারাম ইবনে মুলহান রা.কে হত্যা করে তার ভেতরে কোনো অনুতাপ সৃষ্টি হয় নি। নিজেকে তিনি হতভাগাও মনে করেন নি।

কিছু রহস্য হলো, এই হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পরই তিনি ইসলাম
কবুল করে ধন্য হন!

তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী নিয়েই আমরা এখন তোমাদের
সামনে হাজির হয়েছি! আরো মজার ব্যাপার হলো, এই কাহিনী
আমি আমার ভাষায় নয়, বরং তিনি নিজেই শোনাবেন সেই
বিস্ময়কর কাহিনী। তাঁর ভাষায়—

‘আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী হলো এই— এক অভিযানে আমি
মুখোমুখি হই এক মুসলিম সৈন্যের। যুদ্ধের ময়দানে এক পক্ষ
আরেক পক্ষকে দয়া দেখায় না। আমিও সুযোগ পেয়ে—তাকে
নাগালে পেয়ে দয়া দেখালাম না। বর্শা ঢুকিয়ে দিলাম তার দুই
কাঁধের মাঝখান দিয়ে। আঘাত ছিলো গভীর—প্রাণনাশা। বর্শাটা
টেনে বের করে আমি তাকালাম চোখা ফলকটির দিকে। আমার
চোখে এক ধরনের আনন্দ চকচক করছে। ঠিক তখনই হারাম
ইবনে মুলহানের ‘আনন্দ-ধ্বনি’ আমাকে চমকে দিলো! বর্শাটি বের
করার পর পর তিনি বলে উঠলেন—

فَزْتُ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ!!

কাবার রবের কসম— আমি কামিয়াব!!

তাঁর এই কথা শোনার সাথে সাথে আমার মনে অনেক প্রশ্ন দেখা
দিলো! বলে কী! মৃত্যুর সময় কে বলতে পারে অমন কথা?! এর
মানে কী? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! নাকি যা শুনলাম তা মিথ্যা!
আমি বুঝি, মৃত্যুর মুহূর্তটা মানুষের জীবনের এমন এক মুহূর্ত, যখন
মানুষ ইচ্ছে করেও মিথ্যা ও অসত্য বলতে পারে না! অন্য সময়েও
মিথ্যে বলার অভ্যাস থাকলেও মৃত্যুর সময় কেউ মিথ্যে বলতে
পারে না। আমি কোনো আরবকে মৃত্যুকালে মিথ্যা বলতে শুনি নি!
এক আশ্চর্য আলোড়নে আমি ভেতর থেকে আলোড়িত হতে
লাগলাম! হারাম ইবনে মুলহানের এই শেষ উক্তি যেনো আমার
ভেতরে একটা ঝড় বইয়ে দিয়েছে! এই ঝড় আমাকে কোথায় নিয়ে
যাবে?

দুই.

জাবার ইবনে সালমা এই ঘটনায় আশ্চর্য হতেই পারেন! অস্থির হতেই পারেন! ব্যাকুলচিত্ত হতেই পারেন! আপন মনে বলতেই পারেন—

‘আশ্চর্য! আমি একজন মানুষকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম! প্রচণ্ড জোরে! একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আঘাত! সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর নীল যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো! বেগে বেরিয়ে আসা রক্তে ভেসে যেতে লাগলো! শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে এক্ষুনি! ঠিক তখন তাঁর কণ্ঠে যদি ভেসে আসে—

قُرْتُ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ!!

কাবার রবের কসম— আমি কামিয়াব!!

তাহলে কে অবাক হবে না ঠিক আমার মতো?!!

নিশ্চিত, মৃত্যুর এই শেষ ক্ষণে তাঁর ভেতরে কাজ করেছে—
তাঁর স্ত্রীর বিধবা হওয়ার কথা!

তাঁর ছেলেমেয়ের এতিম হওয়ার কথা!

আর কখনো চাখতে পারবে না সে দুনিয়ার স্বাদেভরা খাবার!

একটু পরই হারিয়ে যাবে স-ব!

নেই খাবার! নেই পানীয়!

নেই সূর্যের আলো! থাকবে না চাঁদের জোছনা!

নেই প্রিয়জনের সাথে বসে-বসে কথা বলা!

নেই রাতের আলাপসঙ্গীর সাথে ঘুম তাড়ানিয়া মিষ্টি কথা!

নেই, কিছুই নেই!

আছে শুধু অন্ধকার একটি গর্ত! কবরের ছোট পৃথিবী!

তারপরও কিসের এ সফলতা?!!

তারপরও তাঁর মুখে কেমন করে উচ্চারিত হতে পারে—

قُرْتُ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ!!

কাবার রবের কসম— আমি কামিয়াব!!

তিন.

আমি এই আলোড়িত মন নিয়ে দ্বারস্থ হলাম কোনো কোনো মুসলিমের! জানতে চাইলাম- এ কথার ব্যাখ্যা বলে দাও আমাকে! তাঁরা আমাকে অকপটে জানালেন- ‘শাহাদত’! আরো বললেন- তিনি ছিলেন মুমিন! বিশ্বাস করতেন আল্লাহ এবং পরকালে! জানতেন-

শহীদ হতে পারলে জান্নাতে পাবেন কী সব নেয়ামত!

অনিঃশেষ নেয়ামত! আল্লাহর সন্তুষ্টি!

মনে যা চায় তা-ই!

কল্পনা যা চায়, তা-ই!

বরং কল্পনার বাইরে আরো কতো-যে কী!

সেসব তাঁর চোখে ভেসে উঠেছিলো- এই শাহাদতের মহালগ্নে!

তাঁর কল্পনায় সাঁতার কাটতে শুরু করেছিলো!

তাই তিনি সব ছাপিয়ে আনন্দঝরা কণ্ঠে বলে উঠতে পেরেছিলেন-

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!!

কাবার রবের কসম- আমি কামিয়াব!!

সব শুনে আমি বলে উঠলাম-

নিঃসন্দেহে সে সফল হয়েছে! অবশ্যই সে সফল হয়েছে!!

চার.

এবার ধীরে ধীরে জাবার ইবনে সালমার চোখ থেকে পর্দা সরে যেতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন-

এই বাহ্য জগতের বাইরেও আছে অন্য একটি অদেখা জগত!

পৃথিবীর এই নায-নেয়ামতের যে স্বাদ ও মজা, তার বাইরেও আছে

আরো স্বাদ ও মজা-যা আরো বেশি স্বাদ ও মজা! আরো বেশি

উত্তম ও উৎকৃষ্ট! আরো বেশি দামি! আরো বেশি অপরিমেয়! সেই

স্বাদ ও মজার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই! সেই স্বাদ ও মজার

ভেতরে যে আনন্দ ও তৃপ্তি, তা অনিঃশেষ-অপরিমেয়! সেই

সেই জগতের যে জীবন, তা মৃত্যুহীন-চিরঞ্জীব!

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘কোনো মানুষ জানে না, তাদের জন্যে চোখ জোড়ানো কী (সব নেয়ামত) অজানা রাখা হয়েছে, তাদেরই সৎকর্মের বিনিময়ে!’

[সাজদা : ১৭]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের আপনি ককখনো মৃত ভাববেন না! বরং তারা তো জীবিত তাদের প্রতিপালকের কাছে, তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়!’ [আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০]

পাঁচ.

আমরা এখন কাহিনীর উপসংহারে চলে এসেছি। উপসংহারের পর্দা টেনে দেওয়ার আগে বলবো—

ঈমানভরা হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসেছিলো সাধারণ একটি কথা!

তা উচ্চারণ করেছিলো সত্যবাদী একটি জিহ্বা!

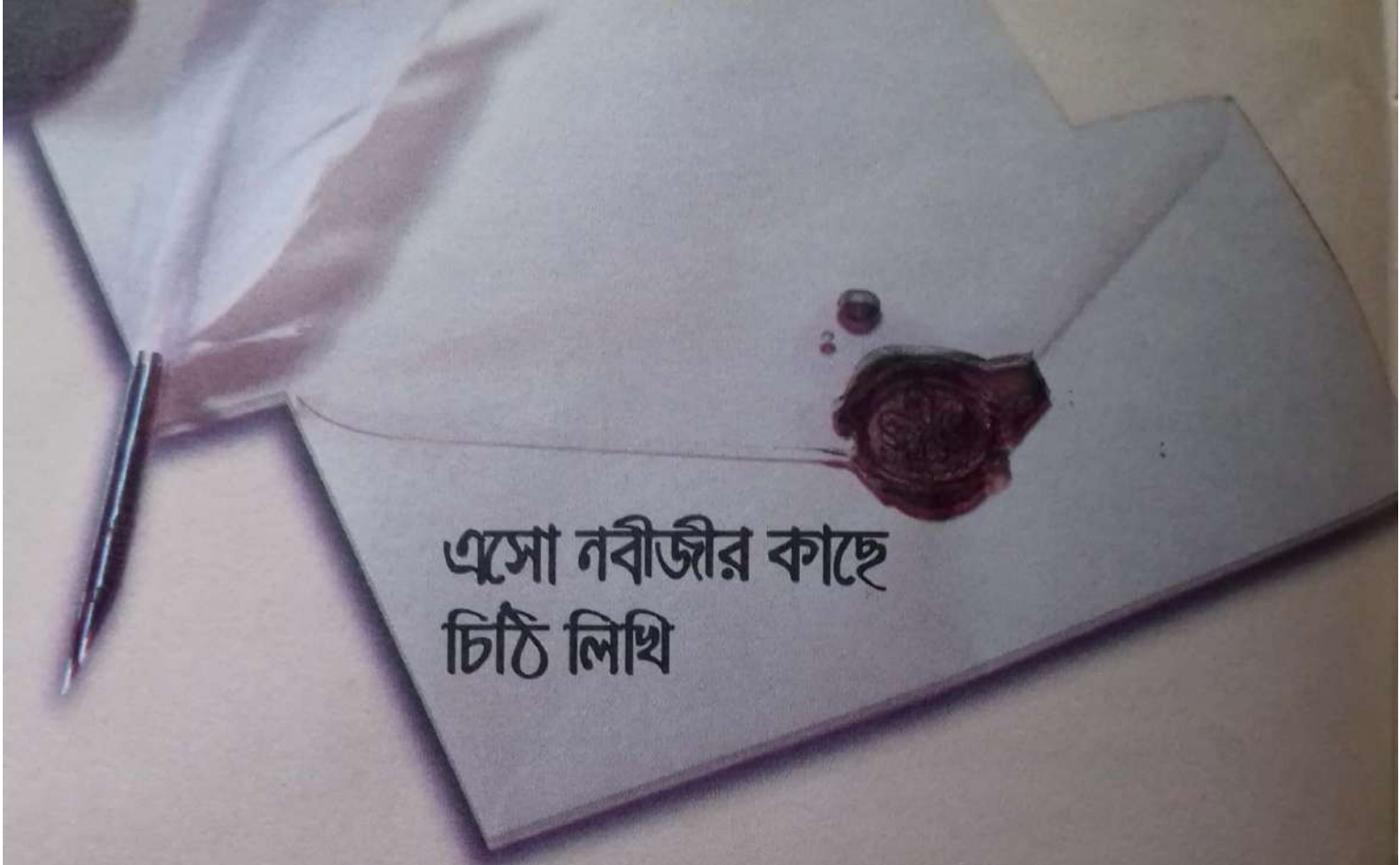
তা-ই কারণ হয়ে গিয়েছিলো এমন এক কাফেরের ইসলাম কবুল করার, যে ছিলো আল্লাহ ও পরকাল থেকে যোজন যোজন দূরে।

তাঁর পৃথিবী সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো। নিজের হাতে বর্শাঘাতে যাকে মেরেছেন তিনি, তাঁর ধর্মই এখন তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়!

সবচেয়ে ভালো! সেই ধর্মের কিতাব—কুরআনই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কিতাব! সেই ধর্মের নবীই তাঁর ভালোবাসা! শ্রেষ্ঠ আদর্শ! শ্রেষ্ঠ

নমুনা!

তাই বলি, কথা যদি হয় ইখলাসপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ, তা-ই জন্ম দেয় ঘোর বিস্ময়! আশ্চর্য ইতিহাস! পরাজিত করে দেয় শক্তিশালী বাহিনীকে! বিজয় করে ফেলে দেশের পর দেশ! হৃদয়ের পর হৃদয়!



এসো নবীজীর কাছে চিঠি লিখি

মনে করো- তুমি প্রবাসে থাকো। অনেক দিন বাড়ি যাও না। বাড়ির জন্যে মনটা আনচান করছে। বার বার মা-বাবার মুখ তোমার সামনে ভেসে উঠছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এলো তোমার কাছে তোমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অথবা কোনো নিকটাত্মীয়। এসে বললেন, আমি যাচ্ছি দেশে। তোমার আবার সাথে আমার দেখা হবে। কিছু বলবে! আমার সাথে পাঠাবে তাকে কোনো চিঠি?!

তুমি নিশ্চিত জানো, তার দেখা হচ্ছেই তোমার আবার সাথে! এমনকি তোমার আবারও তার কাছে তোমার কথা ব্যগ্রচিত্তে (আগ্রহভরে) জানতে চাইবেন। তোমার ভালো খবরে-তোমার সুস্বাস্থ্যের সুসংবাদে তখন তোমার আবার কতো খুশি হবেন!

এবার তোমার কাছে জানতে চাই-

এখন তুমি কী করবে?! ওই বন্ধু বা আত্মীয়কে 'না' করে দেবে? পারবে 'না' করে দিতে? তুমি বরং তাকে বলবে- আপনি আব্বুকে

বলবেন, আমি ভালো আছি! আনন্দে আছি!! তিনি যেনো আমার জন্যে একদম না ভাবেন!! আর এই যে, আমি একটি চিঠিও লিখে দিচ্ছি আপনার হাতে!

* * *

বন্ধু, আমি কী বলতে চাই আসলে? আমি বলতে চাই- ঠিক এমনই ছিলো মুসলমানদের অবস্থা! তারা বিশ্বাস করতেন মৃত্যু হলো আখেরাতের পুল। এই পুল পার না হলে আখেরাতে যাওয়া যাবে না। এই পুল পার হয়ে আখেরাতে গেলে কী হবে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিদার পাওয়া যাবে। জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্যে 'একসঙ্গে' থাকা যাবে! তখন কথায় কথায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে জানতে চাইবেনই- এই, তুমি তো চলেই এসেছো! আচ্ছা বলো তো, আমার বাকি উম্মত কেমন আছে? কেমন দেখে এলে তাদেরকে?!

* * *

শোনো, তোমার ওই বন্ধু বা আত্মীয় কোনো বাধার কারণে দেশে না-ও যেতে পারেন। অথবা গেলেও তোমার আঁকড় সাথে তার দেখা না-ও হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করো, কোনো মুসলমান মারা গেলে সে আখেরাতে পৌঁছবেই! নিঃসন্দেহে! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর দেখা হবেই! নিঃসন্দেহে! আর পরকালে চলে যাওয়া মানুষটি যদি হয় আল্লাহর পথের শহীদ, তাহলে দেখা তো হবেই হবে!!

আচ্ছা, এ পর্যন্ত যা বলেছি, স ব বুঝেছো?! তাহলে এবার এসো, তোমাকে এক শহীদের সত্যিকারের একটি গল্প শোনাই!

* * *

মুসলিম সৈন্যরা লড়াই করতে করতে এবং বিজয় করতে করতে পৌঁছে গেলো শামে। শাম একদিন বিজয় হবে- এ কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন।

لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ.

‘অবশ্যই তোমরা কিসরা (পারস্য সম্রাট) ও কায়সার (রোম-সম্রাট)-এর রক্তভাণ্ডার বিজয় করবে!’

এ বিজয় ছিলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত না হয়ে পারে কি? কুরআনে আল্লাহ বলেছেন-

وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ .

নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই বিজয় লাভ করে। [সাফফাত : ১৭৩]

এই সুসংবাদের পর মুসলিম বাহিনী ছিলো বিজয়ের ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত। তারা লড়ে যেতে লাগলেন। পরাজিত করতে লাগলেন একের পর এক শত্রু বাহিনী। আসতে লাগলো বিজয়। শহরের পর শহর।

এই যখন অবস্থা, তখন ইয়ারমুকের ময়দানে এক যোদ্ধা ছুটে এলেন সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-এর কাছে। এসে বললেন-

‘আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি!’

সেনাপতি বললেন-

‘কী?’

‘আমি শহীদ হতে চাই! শহীদ হলে পরকালে প্রিয় নবীর সাথে আমার দেখা হবে! দেখা হলে আপনার পক্ষ থেকে কিছু কি তাঁকে বলবো! আপনার কোনো প্রয়োজন কি আছে?!

আবু উবায়দা রা. মুগ্ধতা নিয়ে তাঁকে দেখলেন! তারপর বললেন-

‘অবশ্যই তাঁকে আমার অ নেক কিছু বলার আছে! প্রথমেই তাঁকে তুমি আমার সালাম বলবে! আর বলবে- হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে দেখেছি-একটুও বেশকম হয় নি!’

* * *

গল্প এখানেই শেষ! কী ঘোর-লাগা সমাপ্তি, তাই না?! এসো আমরা এমন হই! আমরাও পরকালে নবীজীর সাথে দেখা করে অন্য ভাইদের সালাম পেশ করার স্বপ্ন দেখি! এভাবে নবীজীর প্রতি ভালোবাসা বাড়াই! আল্লাহর প্রতি ঈমান বাড়াই!!



একটুখানি ‘বিলাসিতা’ অনেকখানি তৃপ্তি

এক.

এবার হযরত আবু বকর রা.-এর বেতন-ভাতার গল্প। অনেক ভাতা পেতেন বুঝি তিনি! মোটেই না! সামান্য, খুব সামান্য! কোনো রকমে চলে যেতো সংসার। অথচ তিনি তখন বিশাল বিস্তৃত মুসলিম জাহানের খলীফা। বিশাল বিস্তৃত এমনি এমনি বলি নি। একদিকে আরব বদ্বীপ। অন্যদিকে শামদেশ। শামদেশ অনেকটাই বিজিত হয়ে গেছে। বাকিটুকু বিজয়ের জন্যে যুদ্ধ চলছে।

কিন্তু এই অল্প ভাতায় কেমনে চলতো তাঁর সংসার? ... চলে যেতো! যথেষ্টও হতো! খলীফা হওয়ার আগে হযরত আবু বকর ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। এখন খেলাফতের বড় দায়িত্ব মাথায়। ব্যবসা করার সময় পান না। তাই এই ভাতা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। যতোটুকু না হলেই নয় ঠিক ততোটুকুই নিতেন। একটুও বেশি না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে সবাই খেতেন একটু রুটি আর সামান্য তরকারি। সম্পদ-রাজাদের খাবার-দাবারের মতো কোনো রকমারিতা ছিলো না-কোনো বৈচিত্র্য ছিলো না।

তবে আগেই যেমনটা বলেছি, হযরত আবু বকর যখন ব্যবসা করতেন তখন এতোটা টানাটানি ছিলো না। তখন বেশ কেটে যাচ্ছিলো সংসার। অবস্থা ছিলো এরচেয়ে ঢের ভালো।

দুই.

হযরত আবু বকর রা.-এর পরিবারে যারা ছোট ছিলো তারাও এই খাবারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। শুধু মেরুদণ্ডটা সোজা রাখা। জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা। এর বাইরে ‘ব্যঞ্জন-বৈচিত্র’ কোথেকে আসবে? প্রতিদিন একই রকম খাবার! একই মানের খাবার! রসনা-বিলাসী মিষ্টান্ন ও উপাদেয় ফল-ফলাদি ওরা সামনে পায় না। অথচ একই বয়সের ধনী ছেলেরা এ সব দিব্যি খায়। মজা করে-করে খায়। খাবেই তো! ওদের যে অনেক দিরহাম-দিনার! আছে বাগান! ফল বাগান! খেজুর বাগান! বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য! আরো কতো খেত-খামার!

তিন.

হযরত আবু বকর রা.-এর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বায়না না ধরলেও শুনকো-শুনকো ‘ধৈর্যভরা’ মুখ দেখে স্নেহময়ী মায়ের মন মাঝে মাঝেই হাহাকার করে ওঠে। তিনি মনে-মনে ঠিক করেন একদিন তিনি ছেলেপুলেদের খাবারে বৈচিত্র আনবেন। ওদেরকে মিষ্টিমুখ করাবেন। এক স্নেহময়ী মা এমনটা চাইতেই পারেন, করতেই পারেন! তিনিও তো মানবীয় গুণ-সমষ্টির এক মানবী! একদিন প্রিয় স্বামীর কাছে আবদার জানালেন তিনি। বললেন, একদিন এই খাবার আয়োজনের অনুমতি দেন এবং বাইতুল মাল থেকে অতিরিক্ত কিছু অর্থের ব্যবস্থাও করে দেন। স্বামী বললেন-আমি কেমন করে ব্যবস্থা করবো! বাইতুল মালে দরিদ্র ও অসহায়দের হক রয়েছে! এখান থেকে অর্থ নিয়ে কারো ‘খাদ্য-তৃপ্তি’ লাভের কোনো অবকাশ নেই! স্ত্রী বললেন- আচ্ছা আমি যদি সংসারের দৈনন্দিন খরচ থেকে

একটু-একটু করে সামান্য অর্থ জমা করতে পারি, তাহলে কি আপনার অনুমতি মিলবে! পারবেন কি তা দিয়ে একটু মিষ্টান্ন কিনে আনতে! হযরত আবু বকর রা. বললেন, এটা হতে পারে! কোনো সমস্যা দেখছি না! বরং (খরচ-বাঁচানোয়) তোমার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে!

চার.

এরপর অল্প কয়েকদিনেই স্ত্রীর হাতে কিছু দিরহাম জমা হয়ে গেলো। এখন এ দিয়ে মিষ্টান্ন কিনে আনা যায়। তিনি স্বামীর হাতে তা তুলে দিয়ে মিষ্টান্ন কিনে আনার আবেদন জানালেন!

কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন দিরহামগুলো হাতে নিয়ে দোকানে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বাইতুল মালের খাজাখির কাছে। গিয়ে বললেন, এই নিন! এই দিরহামগুলো বাইতুল মালে রেখে দিন! আর ভবিষ্যতে আমার ভাতা থেকে এই পরিমাণ দিরহাম কেটে রাখবেন! কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাসে এই পরিমাণ দিরহাম না হলেও আমাদের চলে যাবে! আমরা বেঁচে থাকতে পারবো! সুতরাং গড়ে প্রতিদিন আগের চেয়ে ‘এতো’ কমিয়ে দেবেন! বাইতুল মাল মুসলমানদের প্রয়োজন দূর করার জন্যে! খলীফার পরিবারের দস্তুরখান সাজাবার জন্যে নয়!

পাঁচ.

তাই হলো। খলীফা যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই হলো। হিসাব করে গড় বের করে প্রতিদিনের ভাতা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম কেটে দেওয়া হলো! খলীফার পরিবারের জন্যে মিষ্টান্ন আর মিললো না! বিশাল-বিস্তৃত রাষ্ট্রের অধিপতি তিনি। সকাল-সন্ধ্যায় নানা প্রান্ত থেকে রাজধানী মদীনায় এসে ‘আছড়ে পড়ছে’ কতো মালে গনিমত-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ! কিন্তু খলীফার পরিবারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না! আগে যা ছিলো তা-ই! বরং আগের চেয়ে আরো সঙ্কোচন! প্রাপ্তির বদলে বিয়োজন!

প্রিয়তমা স্ত্রী কি মন খারাপ করেছিলেন? না! একটু মন খারাপ করেন নি! কেনো মন খারাপ করবেন? তিনি তো মহান খলীফার মহীরুসী সঙ্গিনী! তিনি একে মোটেই জরিমানা ও ক্ষতি তাবেন নি! আল্লাহ সত্যি বলেছেন—

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ..

“পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্যে আর পবিত্র পুরুষেরা পবিত্র নারীদের জন্যে ॥” [নূর : ২৬]

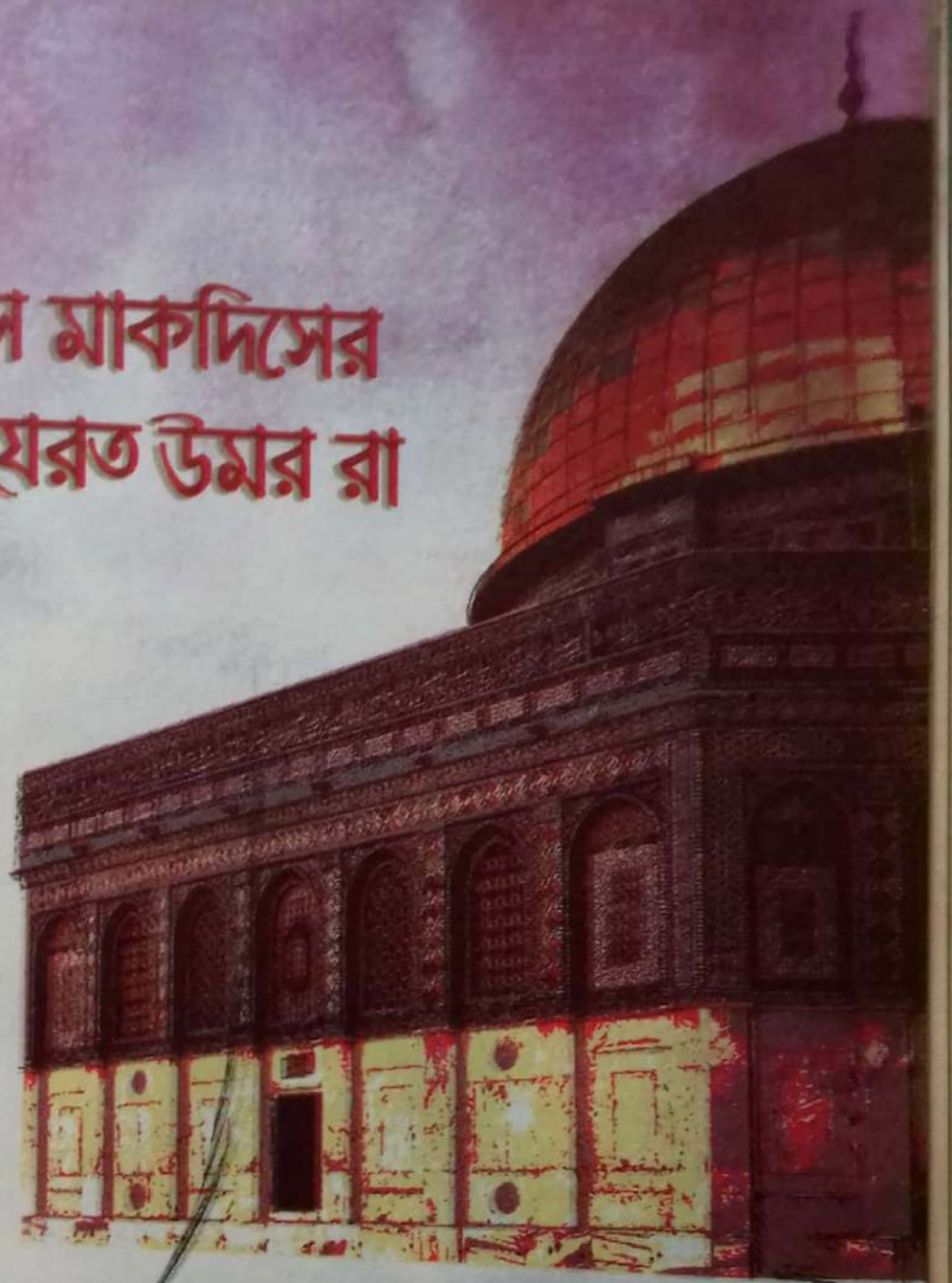
সিদ্ধিকে আকবার হযরত আবু বকর রা. এভাবেই হ্রাসন করে গেলেন উম্মাহর পরবর্তী শাসকদের জন্যে এক উত্তম দৃষ্টান্ত ॥ তিনি তাঁর কাজে-কর্মে-আচরণে বলে গেছেন পানাহারে বিলাসিতা নয়—প্রাধান্য দিতে হবে দুনিয়াবিমুখিতা ও অল্পোতুষ্টিকে! দুনিয়া নয়—আখেরাতই বড়! আল্লাহ বলেছেন—

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ..

“আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী ॥” [কাসাস : ৬০]



বাহিউল মাকদিসের পথে হযরত উমর রা



এক.

খৃষ্টানরা মদীনায় দূত পাঠালো। খোদ হযরত উমরকে লিখলো—
আমরা চাই আপনি নিজে এসে আলকুদস-এ বিজয়ীর বেশে প্রবেশ
করুন! শহরের চাবি আপনার হাতেই আমরা তুলে দিতে চাই!
হযরত উমর কী জবাব দিলেন? দূতকে ‘না!’ করে দিলেন? না! ‘না’
করে দেন নি। ইচ্ছে করলে তিনি ‘না’ করে দিতে পারতেন। বলতে
পারতেন— না! আমি কেনো ওখানে যাবো? দ্রুত তোমরা আমার
সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করো! নইলে আমরা শহরে প্রবেশ করবো!

অস্ত্র দিয়ে শহর জয় করবো! তখন তোমাদেরকে আর ক্ষমা করা হবে না!

কিন্তু মহান খলীফা সে পথে গেলেন না। সে রকম কোনো নির্দেশও দিলেন না। বরং বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন— নিজেই যাবেন ফিলিস্তিন। আলকুদস। বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবেন খৃস্টানদের শেষ দুর্গে।

দুই.

কিন্তু আশ্চর্য! এ দূর পথে বের হলেন খলীফা একা। সাথে স্বেচ্ছায় যেতে চাওয়া এক খাদেম-দাস। আরো আশ্চর্যের খবর হলো— এই দুইজনের সওয়ারী— মাত্র একটি! একটি উষ্ট্রী! মরুভূমির পর মরুভূমি। বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি। মাড়িয়ে যাচ্ছেন খলীফা ও তাঁর খাদেম। একা একা। নিরিবিলি। কিছুটা সময় সওয়ার হন খলীফা। রশি ধরে তখন হেঁটে চলে খাদেম। তারপর খলীফা নেমে যান। উঠতে বলেন সওয়ারীতে খাদেমকে। খাদেম ‘না না’ করে। তবুও তাকে উঠতেই হয়। খলীফা তখন খাদেমের মতো রশি ধরে হাঁটেন। তিনি যেনো এক ভূত্য! আবার যখন আসে তাঁর পালা তখন আবার আগের মতো তিনি সওয়ার হন। এভাবে খাদেমের পালা এলে খাদেম সওয়ার হয়। খলীফার পালা এলে খলীফা সওয়ার হন। খলীফা বলে তিনি একটুও বেশি সওয়ার হন না। খাদেমও খলীফার সম্মানে একটু আগে-ভাগে নামতে চাইলে নামতে পারে না। কখন কে সওয়ার হবে এটিও ঠিক করছেন খোদ খলীফা। এখানেও তাঁর কঠিন ইনসাফ। কড়ায় গণ্ডায়।

* * *

বিশেষ কোনো খাবারও নেই সঙ্গে। এই সামান্য মশকের পানি। একটু রুটি। আর খেজুর। মজার মজার খাবার না থাকলে কী হবে! সারাক্ষণই মুখে ছিলো কুরআনের মিষ্টি তিলাওয়াত। সূরা ইয়াসিনের তিলাওয়াত। ইমান আর এই তিলাওয়াত— এই তাদের আসল পাথর। শ্রেষ্ঠ সম্বল।

তিন.

ইতিহাসের কোন্ রাষ্ট্রনায়ক অমন ছিলেন?

এক মহাবিজয়ের সিপাহসালারের অমন 'জীর্ণদশা' আর কে কোথায় কার মাঝে দেখেছে?

আছে কি ইতিহাসে একটিমাত্র নজির?

ইচ্ছে করলে পারতেন না কি তিনি—

শ্রেষ্ঠ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সসৈন্যে যেতে? জাঁকজমকের সাথে?!

অথবা কমপক্ষে খাদেমের জন্যে পৃথক আরেকটি সওয়ারী নিয়ে?

থেমে থেমে .. ধীরে ধীরে পথ চলতে?

আলিশান তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিতে?

নানা স্বাদের নানা বর্ণের খাবার খেতে?

কিন্তু কিছুই করেন নি তিনি! যে ইসলাম তাঁকে সম্মান দিয়েছে শুধু সেই ইসলামকে বুকে নিয়ে তিনি একা একা পাড়ি দিচ্ছেন বিশালায়তন মরুভূমি। দিগন্তবিস্তৃত মরুবিয়াবান। আর প্রতিফলিত করছেন পদে পদে .. বর্ণে বর্ণে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ। নেই কোনো ভেদাভেদ। আমীরে আর ফকীরে। মনিবে আর গোলামে। এক সওয়ারীতে কী সুন্দর ভাগাভাগি। একবেলা খলীফার। আরেকবেলা খাদেমের। আরেক বেলা শুধু উষ্ট্রির! অর্থাৎ চলতে চলতে এবং সওয়ার বইতে বইতে সওয়ারীরও তো ক্লান্তি আসে! তাহলে সওয়ারীর জন্যেও কেনো থাকবে না একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা? তাই এই ব্যবস্থা! সওয়ার দু'জন কিছুক্ষণ পায়দল হাঁটবেন! সওয়ারী একা একা হাঁটবে!

আহা! কী মহান তুমি হে খলীফা উমর! তোমার ইনসাফের কোনো নজির আসলে দেখে নি এ মাটির পৃথিবী!

চার.

আলকুদস আর বেশি দূরে নয়। আন্তে আন্তে দৃষ্টিতে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে ত্বীন-যাইতুনের সবুজাভ দৃশ্য। কী কষ্টে অতিক্রম করা হয়েছে দীর্ঘ এ পথ। ২৪০০ কিলোমিটার। একটিমাত্র সওয়ারী।

পানি খেজুর আর যবের রুটি! মুখে সূরা ইয়াসিনের তিলাওয়াত! প্রিয় রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত উমর যেনো স্মৃতিচারণ করছিলেন সেই মহাহিজরতের সফরের, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াসিন পড়ে-পড়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গিয়েছিলেন গৃহ থেকে নাগা তলোয়ারের সামনে। সূরা ইয়াসিন সব সহজ করে দিলো! ‘ওয়ামা রামাইতা’র আঘাতে সব কাবু! এখানেও ২৪০০ মাইল কাবু! পৌঁছে গেলেন তারা! কিছুই বাধা হতে পারে নি। আল্লাহু আকবার!

পাঁচ.

আলকুদস অবরোধকারী সৈন্যরা আর বেশি দূরে নয়। এই তো একটু পরই আলকুদসের উপকণ্ঠে পা রাখবেন তারা। প্রথমেই দেখা হবে প্রধান সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা.-এর সাথে। কিন্তু সামনে পড়েছে একটি নিচু ভূমি। পানির চেয়ে কাদা বেশি। জুতা পায়ে পার হয়ে যাওয়া সম্ভব না। এদিকে পালা চলছিলো তখন গোলামের। অর্থাৎ গোলাম এখন উষ্ট্রের উপর সওয়ার। আর খলীফা উমর লাগাম ধরে হাঁটছেন সামনে সামনে। অগত্যা কী আর করা। উমর জুতা খুলে ফেললেন। বগলের নিচে চেপে ধরলেন। আরেক হাতে লাগাম ধরে নামতে লাগলেন সেই কাদা-মাটিতে। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়টা উঠিয়ে। খাদেম কতো বললেন- আপনি এবার আরোহণ করুন! আমাকে নামতে দিন! আমাকে লাগাম ধরে টানতে দিন! কিন্তু খলীফা উমর তার আহ্বানে কোনো সাড়া দিলেন না। গোলামের কণ্ঠের আকুতি হেরে গেলো মহান খলীফা উমরের ইনসাফের কাছে। মহানুভবতার কাছে। দয়া ও বিনয়ের কাছে। উষ্ট্রের উপর বসে গোলাম দেখলো- মহান খলীফা কঠিন কাদা-মাটি ঠেলে ঠেলে পার হচ্ছেন।

এ কী বিরল দৃশ্য! ইসলামী বিজয়ধারার মহানায়ক কাদা-মাটিতে একাকার হয়ে লাগাম ধরে পথ চলছেন আর তাঁর গোলাম বসে আছে উষ্ট্রের উপর! নামতে চেয়েও নামতে পারছে না।

খলীফা উমর রা. পৌছে গেলেন আলকুদসে। হাঁটতে হাঁটতে।
লাগাম ধরে ধরে।

* * *

দামেশক প্রবেশ পথ। অনেকগুলো প্রবেশদ্বারের একটি প্রবেশদ্বার।
এই প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে ভেবে বসে
আছে— সওয়ারী গোলামই বুঝি রোম-পারস্যের মহান বিজয়ী।
অনেকে আবার মনে করে বসে আছে— এরা কেউ-ই খলীফা না!
খলীফা আসবেন আরো পরে। মহাজাঁকজমকের সাথে। এরা
এসেছে খলীফার আগমনের খবর নিয়ে। কিন্তু একটু পর সবার
স-ব ভুল ভেঙে গেলো। খলীফা এ দু'জনের একজন। উষ্টির উপরে
যে বসে আছে সে খলীফার সঙ্গী। খাদেম। গোলাম। এই লাগাম
হাতে নিয়ে-থাকা ব্যক্তিটিই মদীনার খলীফা! পায়ে কাদা! গায়ে
তালিযুক্ত জুবা!

ভিড় বাড়ছে! বিস্ময় বাড়ছে! কেমনে সম্ভব! কীভাবে সম্ভব? এমন
আবার হয় নাকি? সৈন্যরা এসে ভিড় করলো। ধর্মজায়কেরা এসে
ভিড় করলো। সর্বস্তরের মানুষ এসে বিস্ময় দেখতে লাগলো।
'হে বিস্ময়, তুমিও এসে হাজির হও—দেখো এ বিস্ময়!!'

কারো মুখে বিস্ময়ঝরা প্রশ্ন— কোনজন খলীফা বললে?! যিনি
হাঁটছেন তিনি?! হ্যাঁ, যিনি হাঁটছেন তিনিই খলীফা! দুজন মিলে
এসেছেন তারা। সওয়ারী একটি। পালায় পালায় তাঁরা পথ
চলেছেন। একবার গোলামের পালা। আরেকবার খলীফার পালা।
আরেকবার উষ্টির পালা। এখন চলছে গোলামের পালা। তাহলে
গোলাম কেনো উপরে থাকবে না? খলীফা কেনো নিচে থাকবেন না?
ইসলাম এমনই। ইসলামের খলীফাও এমনই। ইসলামের সবকিছুই
এমন।

হয়.

দামেশক প্রবেশদ্বারের সামনে এসে খলীফা থামলেন। একটু পরই

এলেন সাফারুনিউস (Safronius)-পাদ্রী প্রধান। তার হাতেই শহরের চাবি। বললেন- এই নিন আলকুদসের চাবি! আপনার হাতে এই চাবি তুলে দিতেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম! দিন গুনছিলাম! আপনি এসে পড়েছেন! আর দেরি নয়! এবার বুঝে নিন আপনার শহর আলকুদস ও তার চাবি! আজ থেকে এই শহর আপনার! আমাদের কিতাবে লেখা আছে- যার হাতে হস্তান্তর করতে হবে এই চাবি, তাঁর তিনটি গুণ থাকতে হবে। আমরা আপনার ভেতরে সেই গুণ তিনটি খুঁজে পেয়েছি! আপনিই এই শহরের পবিত্র হকদার! এই চাবির প্রকৃত মালিক!

প্রথম গুণ- তিনি আসবেন পায়ে হেঁটে আর তাঁর গোলাম আসবে সওয়ার হয়ে! দ্বিতীয় গুণ- তাঁর পদযুগল থাকবে কাদামাখা। তৃতীয় গুণ- তাঁর পরিহিত জুব্বায় থাকবে ১৭টি তালি! আল্লাহর কসম! এ সবই আপনার মাঝে পাওয়া গেছে!

সাত.

সাফারুনিউস (Safronius)কে হযরত উমর বললেন- আমার জামাটি ধুয়ে সেলাই করার ব্যবস্থা করে দিন! আর অন্য একটা জামা এনে দিন, আপাতত পরি। তাই হলো। সাফারুনিউস একটি জামা নিয়ে এলো। কাতানের তৈরি। হযরত উমর রা. বললেন- (সুন্দর তো!) কী এটি?

কাতান!

কাতান কী!

তখন খলীফাকে কাতানের কথা জানানো হলো।

খলীফা তখন কাতানের জামাটি পরে নিজের জামাটি খুলে দিলেন।

সাফারুনিউস বললেন, আচ্ছা, আপনি তো আরব শাসক! সেই আরবের মানুষ হয়ে কেনো এলেন এতো দূরে এই উষ্ট্রী নিয়ে! একটা তুর্কি ঘোড়া হলে কি ভালো হতো না?! এই মোটা কাপড়ের পোশাকটাও কি একটু বদলে আসা যেতো না?!

খলীফা তখন উত্তরে বললেন- দেখুন! আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত

করেছেন শুধুই ইসলাম দান করে! তাই এর বাইরে আমরা কোনো বদলা চাই না! (ইসলাম থাকলেই আমরা আছি! ইসলাম না থাকলে আমাদের কোনো সম্মান নেই!)

আট.

এমনই ছিলেন হযরত উমর রা.। তাঁর নাম শুনলে বড় বড় রাজা-বাদশাদের ঘুম টুটে যেতো। তাঁর বিজয়ধারা ইসলামের মানচিত্রে যোগ করেছিলো দেশের পর দেশ। দিগন্তের পর দিগন্ত। মদীনা থেকে বাইতুল মাকদিসে এই-যে তাঁর সফর, তার পথে-পথেও অতিক্রম করেছেন তিনি এমন সব শহর-নগর, যেখানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি সভ্যতা, ভব্যতা ও উৎকর্ষ। কী দৃষ্টিকান্ড! কী বিস্ময় জাগানো!!


وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

ইজ্জত ও সম্মান শুধুই আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের।

[কাসাস : ৬০]^১

১ গুরুত্ব দিকে মূলের তরজমা করা হয় নি। কাহিনীকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

- অনুবাদক



দানের আকাশ ঝরেই ঝরে

আমরা সবাই ভালো কাজ পছন্দ করি। ভালো কাজ দেখে-দেখে
মুগ্ধ হই। কল্যাণের কাজ করে-করে আনন্দ পাই। যে করে তাকে
কৃতজ্ঞতা জানাই। মনে করো—
কেউ অভাবীর অভাব মোচন করলো,
দরিদ্রের দারিদ্র দূর করতে এগিয়ে এলো,
সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলো,
বিপদগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে এলো,
ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিলো,
শোক-বিহ্বলকে সান্ত্বনা দিলো,
তার জন্যে কী বিনিময়? অনেক অনেক!
আল্লাহর পক্ষ থেকেও, বান্দার পক্ষ থেকেও!
বান্দা খুশি হয়ে বলে তার উদ্দেশে—

এই, তুমি অনেক ভালো মানুষ! কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো?!
জাযাকাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন!!

আর আল্লাহর কাছে তো রয়েছেই বদলা! অ নে ক বদলা! একের
বদলে সাতশো! আল্লাহ চাইলে আরো অনেক বেশি!!

কিন্তু এই ভালো কাজ হওয়া উচিত সামর্থ অনুযায়ী। ক্ষমতা অনুযায়ী।
সামাজিক স্তর ও মর্যাদা অনুযায়ী। যার যে অবস্থান ঠিক সে
অবস্থানে থেকেই সে ভালো কাজ করবে। অন্যের সহযোগিতায়
এগিয়ে আসবে। একজনের ক্ষমতা আছে অ নে ক বেশি দান
করার, সে কেনো অ নে ক কম দান করবে?

কবি কী সুন্দর বলেছেন-

على قلوب أهل العزم تلقى العزائم *** وتلقى على قلوب الكرام الكلام

যার ভেতরে সংকল্পের ‘খনি’ আছে, তার কাছেই সংকল্প এসে ভিড়
করে- সাফল্যের আলোকিত ছবি হয়ে। উন্নত চরিত্রও তাই।
অভিজাতের উন্নত চরিত্র মহান আর কমজাত কমিনার চরিত্র ছড়ায়
শুধু তার ভেতরের কালিমা।

* * *

হযরত হাসান রা.। বাবা হযরত আলী রা.। মা হযরত ফাতেমা
যাহরা রা.। নানা কে? বোঝাই যাচ্ছে! সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের এই গল্প হযরত
হাসান রা.কে নিয়ে। দেখতে তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের
মতোই অনেকটা! শুধু দেখতে বলছি কেনো? তাঁর সীরাত ও
আচার-আচরণও ছিলো আল্লাহর রাসূলের সীরাত ও
আচার-আচরণের ছায়া ও প্রতিবিম্ব যেনো!!

আল্লাহর রাসূল তাঁর এই নাতি সম্পর্কে বলেছেন-

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ -

আমার এই ছেলে (নাতি একদিন) নেতা হবে!

একবার হযরত হাসান রা. মদীনার একটি বাগানের পাশ দিয়ে পথ চলছিলেন। তখন বাগানের একটি দৃশ্যের উপর তাঁর চোখ আটকে গেলো। বাগানের মালী আসওয়াদ বসে আছে। পাশেই একটি কুকুর। প্রচণ্ড ক্ষুধায় জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছে। আসওয়াদের দিকে চুকচুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। আসওয়াদ কাজ শেষে মাত্রই খেতে বসেছে। তার পেটেও রাজ্যের খিদে। হাতে কেবল রুটি নিয়েছে। মুখে দেবে। অমনি এই কুকুর এসে হাজির। আসওয়াদের মুখে খাবার রুচলো না। কুকুরের ক্ষুধা-কাতর অবস্থা দেখে আসওয়াদের মনটা হু হু করে কেঁদে উঠলো। আসওয়াদ সিদ্ধান্ত নিলো এ রুটি সে আর একা খাবে না। ‘দুজনে’ মিলে খাবে। একেবারে সমান সমান ভাগ হবে। একভাগ আসওয়াদ খাবে আরেক ভাগ কুকুরটিকে খাওয়াবে।

* * *

তাই হলো। আসওয়াদ এক টুকরো রুটি খায় আরেক টুকরো তুলে দেয় কুকুরটির মুখে। কুকুরের ভাগের সর্বশেষ টুকরোটিও মুখে তুলে দিলো আসওয়াদ কুকুরের।

এ যেনো বাণিজ্যিক পণ্য। ভাগ হচ্ছে দু’জনের মাঝে সমান সমান। একটু বেশকম হলেই যেনো একজন ঠকে যাবে আরেকজন জিতে যাবে। দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা হযরত হাসান রা. নিরীক্ষণ করলেন! সীমাহীন অভিভূত হলেন! বিস্মিত হলেন! অমন অচেনা দৃশ্য দেখলে কে-না বিস্মিত হবে? প্রচণ্ড ক্ষুধায় একটুখানি ‘নির্ধারিত’ খাবার সাধারণত মানুষ একা একাই খেতে বসে। কে ভাগ দেয় নিজের এই সামান্য খাবারে অন্যজনকে! এই যে আসওয়াদ একটা অংশ বিলিয়ে দিলো, এটা বিরল। এ-ই ছিলো হয়তো তার আজকের খাবার। আর খাবার মিলবে না সারাদিনে। তবুও আসওয়াদ কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয় নি। নিজের পেটে বেসামাল ক্ষুধা নিয়ে ভাগ দিয়েছে। আসওয়াদ ইচ্ছে করলে কুকুরটিকে রুটি নাও দিতে পারতো। নিশ্চয়ই এই কুকুরের কোনো মনিব আছে।

এর জন্যে নির্দিষ্ট খাবারও হয়তো বরাদ্দ আছে। অথবা কুকুরটি বাগানে ঘুরে ঘুরে খাবার যোগাড় করে নিতে পারতো। কিন্তু আসওয়াদ এসব ভাবে নি। আসওয়াদ ভেবেছে শুধু কুকুরের ক্ষুধা নিয়ে। নিজের মুখের গ্রাস তুলে দিয়েছে কুকুরের মুখে!

* * *

হযরত হাসান দৃশ্যটা দেখলেন। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আসওয়াদকে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন- অমন বিস্ময়কর ভাগাভাগি! যা খেয়েছো তুমি তা-ই দিয়েছো কুকুর-টিকে! যতোটুকু তুমি খেয়েছো ততোটুকুই দিয়েছো! কেনো এই বিস্ময়কর সমতা!! কী এমন হতো একটু কম দিলে?! কে তোমাকে ধমকাতো? শাসাতো? এ ছাড়া কুকুরেরও তো ভাষা নেই যে মুখ ফুটে তোমার কাছে সমান সমান দাবি করবে?!

আসওয়াদ সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি উত্তর দিলো-

সায়িদি! কুকুরটির করুণ চোখ দেখে আমি সহ্য করতে পারি নি! অমন ক্ষুধা-কাতর দৃষ্টিকে কেমনে আমি প্রতারণা করি? কেমনে আমি কম দিই?!

* * *

একটু আগে দেখা দৃশ্যটি ছিলো যেমন বিস্ময়কর এখন শোনা এই জওয়াবটাও তেমনি বরং আরো বেশি বিস্ময়কর!

অমন সুন্দর করে কয়জন ভাবতে পারে?!

একটি কুকুরের ক্ষুধায় কার দিল-মন এবং আঁখিযুগল অমন ছলছল করে ওঠে?!

হযরত হাসানের 'দাতা মন' কথা বলে উঠলো!

তাঁর 'মহান চরিত্র' কলরব করে উঠলো!

উঠবেই তো! এ যে প্রিয় নানাজানের কাছ থেকে পাওয়া তাঁর গরবের উত্তরাধিকার!!

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। [কলম:]

* * *

হযরত হাসান নিজের কাজের কথা ভুলে গেলেন! গোলামের কাছে
জানতে চাইলেন—

তোমার মনিবের পরিচয়?! কার গোলাম তুমি?!

আবান ইবনে উসমান আমার মনিব!

আর এই বাগান?!

এই বাগানও আমার মনিবের!

আসওয়াদ শোনো, আমি একটু আসছি! না আসা পর্যন্ত তুমি এখান
থেকে একটুও নড়বে না!!

* * *

হযরত হাসান ফিরে এলেন। তাঁর মুখে দ্যোতিত হাসি। যেনো
পুষ্পের হাসি! এসেই বললেন, আসওয়াদ, এইমাত্র আমি তোমাকে
খরিদ করে এলাম! তুমি এখন আমার গোলাম! এই বাগানও এখন
আমার! তাও খরিদ করে এসেছি!!

আসওয়াদ শ্রদ্ধা-বিনম্র হয়ে বললো— মনিব, হাজির আপনার
অনুগত বান্দা!! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের পর আপনার
নির্দেশ পালনই আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব!

হযরত হাসান হাসছেনই, সেই একই হাসি! আনন্দ মেশানো!
মুগ্ধতা মেশানো! হ্যাঁ, এই মিষ্টি হাসির আবীর সারা চোখে-মুখে
ছড়িয়ে দিয়ে তিনি এবার উচ্চারণ করলেন—

আসওয়াদ! কথা শেষ হয় নি! তুমি আর আমার গোলাম নও! তুমি
আযাদ-মুক্ত-স্বাধীন!! আরো শোনো আসওয়াদ! এই-যে আমার
সদ্য ক্রয়-করা বাগান, সে-ও এখন আমার নয়— তোমার! তোমার
জন্যে আমি তা ‘মুক্ত’ করে দিলাম!!

তুমিই এখন থেকে এই বাগানের মালিক!!

আসওয়াদ বিস্মিত!

আসওয়াদ বিমুগ্ধ!

আসওয়াদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না!

আশ্চর্য! কী করে কয়েক মুহূর্তে আসওয়াদ দাসত্বের আঁধার থেকে

স্বাধীনতার মুক্ত আলোয় বেরিয়ে এলো?
কী করে 'নিঃশ্ব' আসওয়াদ দাসত্বমুক্ত হয়ে এই বাগানেরও মালিক
হয়ে যেতে পারে?!

হে আমার মন!

সত্যি তুমি আযাদ হয়ে গিয়েছো?!

তুমি সত্যি সত্যি এখন এই বিরাট বাগানের মালিক?!!

* * *

একটু ভাবো তো- কী চড়া মূল্যে হযরত হাসান ক্রয় করে এসেছেন
এই গোলাম ও বাগান?!

অ নে ক অ নে ক! বোঝাই যাচ্ছে!!

ক্রেতার ইচ্ছায় বিক্রি হলে পণ্যের মূল্য বেড়েই যায়!

আহা, একটু আগের আসওয়াদ একটু পর কী হয়ে গেলো!

ছিলো দাস এখন মুক্ত স্বাধীন!

ছিলো বাগানের মালী এখন মালিক!

আসওয়াদ কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা
এই মহান মানুষটির?!

এই মহাসমুদ্রের?!

সমুদ্রের কথা বলে কি শেষ করা যায়?

সমুদ্রের কাতরা কাতরা জলরাশি কে পারে গুনতে?

আছো কি কেউ, গুনতে চাও?!!

তাহলে গুনে যাও!

যেতেই থাকো!

শোনো, তুমি 'নিঃশেষ' হয়ে যাবে!

তবু শেষ হবে না এই কাতরা কাতরা জলরাশি!!

হযরত হাসানও এই সমুদ্রের মতোই!

পারবে কি গুনে গুনে শেষ করতে তাঁর দানের কথা?!

গুণের কথা?!

পারবে না!

আবার বলছি, পারবে না!



এমন শাসক কোথায় পাবে বলো

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কে ছিলেন? এক কথায় বলা কঠিন! কেননা তিনি একসঙ্গে অ নে ক কিছু ছিলেন।

তিনি উমাইয়া খলীফাদের ভেতরে অতুলনীয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

তিনি খামিসুল খুলাফা আররাশিদীন-পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদা।

তিনি নিজের সময়ের সেরা শাসক-শ্রেষ্ঠ শাসক।

তিনি সে সময়ের 'বড়' শাসকও! দামেশকে বসে সুবিশাল এক রাজ্য শাসন করতেন।

কন্তো বড় ছিলো তাঁর রাজ্যের পরিধি! একদিকে শাম, মিসর, ইরাক, আলজাযিরাতুল আরাবিয়্যাহ, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, ইরান, খোরাসান- সবই ছিলো তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে বিজয় অর্জিত হতে-হতে একেবারে হিন্দুস্তানের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো তাঁর মহারাজ্যের পরিধি!

* * *

বন্ধু, এমন মহান খলীফার জীবনের টুকরো টুকরো কথা এখন তোমাকে বলবো। পড়ে আশ্চর্য হবে। বিস্মিত হবে। মুগ্ধ হবে। হবেই-না হয়ে পারবে না!

খলীফা হওয়ার পর তিনি বদলে গেলেন। আগের জীবনের সাথে পরের জীবনের কোনো মিল নেই! এই-যে বদলে যাওয়া- তা শুধু তাঁর নিজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিলো না! অন্যকেও স্পর্শ করলো! পরিবারকে স্পর্শ করলো! পরিবারের মালিকানকেও স্পর্শ করলো! কী সুন্দর এই বদলে যাওয়া!

এই বদলে যাওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না!

এভাবে বদলে যেতে সবাই পারে না!

মহান ছাড়া! মহীয়সী ছাড়া!

কীভাবে বদলে গেলেন খলীফা?

কীভাবে বদলে গেলেন মহীয়সী মালিকান?

* * *

নতুন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ নিজের সমস্ত সম্পদ জড়ো করে বাইতুল মালে জমা করে দিলেন! স্ত্রীকে বললেন, কী আছে তোমার কাছে আনো! অর্থকড়ি সব! সোনাদানা সব! সব বাইতুল মালে জমা করে দেবো!

অপরদিকে জীবনযাত্রার মান ও লেবাস-পোশাকেও নেমে এলো 'সাদাসিধে হওয়া'র এক মহাপ্রতিযোগিতা! অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, তাঁর দুনিয়াবিরাগ, তাঁর সাদাসিধে চাল-চলন, তাঁর জীবনমান বড় বড় দুনিয়াবিরাগ আল্লাহওয়ালা সাধকদেরকেও পেছনে ফেলে দেওয়ার জোগাড় হলো!

পৃথিবীর সেরা ও শ্রেষ্ঠ শাসকের জীবন এমন হতে পারে? এই প্রশ্ন সবার মনে। এই প্রশ্নের ছায়া সবার মুখে! মনে হচ্ছিলো তিনি যেনো কোনো উমাইয়া খলীফা না! উমাইয়া বংশের সাথে তাঁর যেনো কোনো সম্পর্ক নেই! তিনি যেনো সরাসরি নানাজান উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সাথে সম্পর্কিত! তাই তাঁর সবকিছুতে জ্বলে জ্বলে উঠছে- 'উমরি বলক'!

* * *

মাঝে মাঝে এমনও হতো যে নামাযের সময় হয়ে গেছে, অথচ তিনি মসজিদে যেতে পারছেন না! দেরি হয়ে যাচ্ছে! কারণ তাঁর একমাত্র জামাটি এখনো শুকায় নি! তাহলে কী পরে যাবেন তিনি মসজিদে?! আল্লাহ্ আকবার!!

তাঁর প্রতিদিনের ভাতার পরিমাণটা শুনলে তুমি চমকে উঠবে! মাত্র দুই দিরহাম! না, এরচেয়ে এক দিরহামও বেশি না!! অথচ তখন তাঁর রাজ্যের সাধারণ কর্মচারীদের মাসিক বেতন ছিলো তিনশো দিনার!! কেনো এমন?! যেনো তারা খেয়ানত না-করে!! অভাবে পড়ে দুর্নীতি না করে!

* * *

তাঁর জীবনে এমন চমকে ওঠার মতো ঘটনা আরো অনেক আছে! কয়টা বলবো তোমাকে? বলে বলে সত্যি শেষ করা যাবে না!

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শীতে গরম পানির প্রয়োজন হতো! সাধারণ জনগণের চুলোয় তিনি পানি গরম করতেন না!

যখন কেউ তাঁর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতো, তখন উত্তর দেওয়ার সময় তিনি বাতি বন্ধ করে দিতেন! আনাতেন নিজের তেলের বাতি অথবা অন্ধকারেই দিতেন ওই প্রশ্নের উত্তর! কেননা বাতি জ্বলছিলো বাইতুল মালের খরচে আর প্রশ্নের উত্তর একান্তই ব্যক্তিগত! বাইতুল মালের বাতির আলোয় বসে-কেনো তিনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবেন? এ-ও তো রাষ্ট্রের সম্পদ নিজের কাজে ব্যবহার করার মতোই!

* * *

একবার তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। পরিবারের সবাইকে একটু সময় দেবেন বলে। কিন্তু এ কী! মেয়েরা কাছে তো এসেছে কিন্তু সবাই মুখে হাত রেখে কথা বলছে! কারণ জানতে চাইলেন তিনি! এক মেয়ে জানালো যে, গৃহে ডাল আর পেয়াজ ছাড়া খাওয়ার মতো কিছুই নেই! আমরা তা-ই দিয়ে খেয়েছি! তাই মুখে হাত দিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, যাতে আপনার নাকে দুর্গন্ধ না লাগে! এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন প্রিয় খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ! বললেন- মেয়েরা আমার! বৈচিত্র্যভরা রং-বেরঙের উপাদেয় খাবার

কী কাজে আসবে বলো, যদি তা তোমাদের আঁকুকে জাহান্নামে নিয়ে যায়?! ... কান্নাঝরা এ দুঃখ-জওয়াবে মেয়েরা আর কথা বলতে পারলো না- নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো! তারা মেনে নিলো এই কষ্টঘেরা জীবন এবং এই সাদাসিধে খাবার! অথচ তাদের বাবা পৃথিবীর শক্তিদর শাসক! তাঁর রাজ্যের সাধারণ কর্মচারীদের জীবনও কতো সুখদ! কতো নরোম! কতো রকমারি!

* * *

খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ শুধু নিজের জন্যেই না, রাজ্যের উচ্চাসনে আসীন সবাইকে এই সাদাসিধে জীবনের তাগিদ দিতেন। চিঠি পাঠিয়ে পাঠিয়ে বলতেন- নিজেদের কথা ভুলে যাও! মানুষকে দিয়ে যাও অকৃপণ হাতে!

তিনি একেকটি দিরহামকে মনে করতেন একেক ফোঁটা রক্ত। এ রক্ত অবশ্যি বইতে হবে শুধু 'আপন' শিরায়-অন্য কারো শিরায় নয়! তিনি আরো মনে করতেন- এই দিরহাম বিলাসিতা করার জন্যে নয়!

একবার এক রাজকর্মী তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র লেখার জন্যে কিছু কাগজ চাইলেন। জবাবে তিনি লিখে পাঠালেন- শোনো, আমার চিঠি তোমার কাছে পৌঁছামাত্রই তোমার কলমটিকে সরু করবে (যেনো কালি কম লাগে)! আর ছড়িয়ে ছড়িয়ে লিখবে না, খুব লাগিয়ে লাগিয়ে লিখবে, তাহলে অল্প কাগজে অনেক বেশি লিখতে পারবে! এক পৃষ্ঠায় যতোটা সম্ভব অনেক প্রয়োজনের কথা লিখতে চেষ্টা করো! মুসলমানদের সম্পদ নষ্ট করে বেশি কথা লেখার কোনো দরকার নেই! ওয়াস সালামু আলাইকুম।

* * *

আরেকবার এক রাজকর্মী খলীফার কাছে পত্র পাঠিয়ে বললো- আগে অনেক কর জমা হতো। এখন খুবই খারাপ অবস্থা। জমা হয় না বললেই চলে। কারণ আর কিছুই না, করদাতা কমে গেছে! খলীফা পত্রের জবাবে বললেন- শোনো, (তোমার কথায় আমি খুব কষ্ট পেলাম) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন মুসলমান বানানোর জন্যে, কর উসূল করার জন্যে নয়!



সকল প্রশংসা শুধু তাঁর

মনে করো, তুমি কোনো ভালো ও মহৎ কাজ করেছো, যা মানুষের দৃষ্টি কাড়বে, মানুষের ভেতরে বিস্ময় ও মুগ্ধতা সৃষ্টি করবে; তাহলে নিশ্চিত তোমার ইচ্ছে করবে—

সবার সামনে তা তুলে ধরতে, একটু পরিচিত হতে ।

একটু প্রশংসিত হতে ।

একটু আলোচিত হতে ।

একটু স্মরণীয় হয়ে থাকতে ।

এটি হয়-ই-হওয়া খুব স্বাভাবিক । এমনটি কেউ চাইলে চাইতেই পারে । এ জন্যে মোটেই তার ভাগ্যে কোনো তিরস্কার মেলা উচিত হবে না । তাহলে বড্ড মন খারাপ হয়ে যাবে । ঠিক না?!

কিছু আমি এখন তোমাকে শোনাবো এক বিস্ময়কর কাহিনী! এ কাহিনী ইসলামের সোনালি যুগের চিত্র। সোনালি যুগের সোনার মানুষের চিত্র। সত্যি তাঁরা ছিলেন সোনার মানুষ। অমন সোনার মানুষ যে, পৃথিবীভরা সোনা দিয়েও যাঁদের একজনের মূল্যও নির্ধারণ করা যাবে না! কারণ আর কিছুই না! তাঁরা ছিলেন নবীর মাদরাসা-মাদরাসাতুস সুফ্ফার ছাত্র। ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা এখানে নবীর কাছে। বেড়ে উঠেছেন আসমানী ওহীর পূর্ণ ও প্রাজ্ঞ তত্ত্বাবধানে। এ কারণেই তাঁরা আমাদের মতো মানুষ হয়েও আমাদের মতো ছিলেন না। নবীর সান্নিধ্য-পরশে হয়ে গিয়েছিলেন সোনার চাইতেও বড় সোনা।

তাঁদের ইখলাস শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করে! করবেই! কেননা আমাদের সমাজে এই ইখলাস কল্পনাই করা যায় না! প্রশংসনীয় কাজ করে তাঁরা আমাদের মতো প্রশংসিত হতে পছন্দ করতেন না! তাঁরা 'আমি' বলতে একদম রাজি ছিলেন না! খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি তাঁদেরকে আনন্দ দিতো কি? মোটেই না! দিতো শুধু কষ্ট!

সত্যি কথা কি; তাঁদের জীবনের ধাপে ধাপে-স্তরে স্তরে লুকিয়ে ছিলো শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়! মুগ্ধতা আর মুগ্ধতা! ইতিহাসবিদেরা এই বিস্ময় ও মুগ্ধতার চিত্র আঁকতে আঁকতে রীতিমতো ক্লান্ত! বিস্মিত! স্তম্ভিত!

প্রিয় পাঠক, আর দেরি নয়-চলো সেই সোনালি যুগের গল্প শুনতে!

* * *

মুসলিম সৈন্যরা তখন মাদায়েনে-রোমের প্রাণকেন্দ্রে। বিজয়ীর বেশে। একে একে জমা হচ্ছে মালে গনিমত-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। সব জমা নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ। সবাই বহন করে-করে নিয়ে এসে জমা করছে তাদের কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মালে গনিমত নিয়ে হাজির হলেন এক মুজাহিদ। উপস্থিত দায়িত্বশীল সৈনিকেরা তা গ্রহণ করে নিজেদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। ইয়া আল্লাহ! এ যে মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার!! তাদের বিস্ময়ের কোনো অবধি রইলো না!

বিস্ফারিত চোখে তারা বললেন- এ পর্যন্ত যা জমা হয়েছে, সে সবার মূল্যমান ছাড়িয়ে যাবে এ সম্পদ! আমরা অমন মহামূল্যবান সম্পদ জীবনে কখনো চোখে দেখি নি! আচ্ছা ভাই, তুমি তো এখান থেকে কোনো অংশ সরিয়ে ফেলো নি?!

এই প্রশ্নে আহত হলেন ছদ্মবেশী মুজাহিদ! খুব লাগলো বুঝি মনের পবিত্র পর্দায়! বাঁঝালো কণ্ঠে মুজাহিদ উত্তর দিলেন- ‘আমি বেঈমান বিশ্বাসঘাতক হলে এই রত্নরাজি আপনাদের পর্যন্ত বয়ে আনতাম না!’ স্নিগ্ধ প্রভাতের শিশিরকণা যেমন সকালের সূর্যতাপে শুকিয়ে ‘নেই’ হয়ে যায়, এই সৈনিকের জবাবেও সবার মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেলো। সবাই বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বললেন, সত্যি তুমি মহান! বিশ্বস্ত! কিন্তু ভাই, তোমার পরিচয়? সৈনিক বললেন, আমার প্রশস্তি ছড়ানোর জন্যে আপনাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না! অন্য কারো কাছেও না! সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর! তাঁর বিনিময়ই শ্রেষ্ঠ বিনিময়!

* * *

এ কথা বলে সৈনিক আর দাঁড়ালেন না-সোজা নিজের গন্তব্যের পথ ধরলেন। কিন্তু অন্যরাও নিজেদের অপার কৌতূহল দমাতে পারলেন না। একজনকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পেছনে পেছনে, পরিচয় আবিষ্কার করতে! অমন আমানতদার মানুষের পরিচয় না জানলেই যে নয়!

ছদ্মবেশী অনুসরণকারী যেতে-যেতে একেবারে সৈনিকের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তারপর অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর পরিচয়ও জেনে নিলো! তারপর হাসতে হাসতে ফিরে এলো!


কে এই মহান বিশ্বস্ত সৈনিক?! ...

তিনি হযরত আমের ইবনে আবদে কায়স রা.!

আল্লাহ সত্যি বলেছেন-

إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

‘যদি তোমরা কোনো কিছু প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, (আল্লাহ জেনেই ফেলবেন। কেননা) আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।’ - [আলআহযাব : ৫৪]



এক মহাবীরের দয়ালু বীরের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী।^১ অল্প কথায় তাঁর পরিচয় তুলে ধরা মুশকিল। তাঁর জীবনের পূর্ণচিত্র নয়— যদি টুকরো টুকরো কথাও বলতে যাই, তাহলে অ নে ক বড় একটি কিতাব হয়ে যাবে!

তিনি ছিলেন ইসলামের এক বিস্ময়কর ‘মুজিয়া’!

তিনি ছিলেন এক ‘আকাশ বীর’!

বার বার আকাশের মদদে ও ইশারায় ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। সবচেয়ে বড় বিজয়টি অর্জিত হয়েছে হিত্তীনে। ইউরোপিয়ান খৃস্টান ক্রুসেড যোদ্ধাদেরকে হিত্তীনে তিনি এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন যে, তারা আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে নি! এই মহাবিজয়ের মাধ্যমেই ফিরে এসেছে প্রিয় ফিলিস্তিন—প্রিয় আলআকসা, নব্বই বছর পরে! শেষ হয়েছে ফিলিস্তিনের উপর ইসলাম-বিদ্বেষী দুষ্টচক্রের ক্রুসেড শাসন! মুক্ত হয়েছে জাযিরাতুল আরব ও ইসলামের পবিত্র সব ভূখণ্ড অজানা অচেনা দুশমনের কবল থেকে!

১ জন্ম- ৫৩২, ওফাত- ৫৮৯ হিজরী

হিন্তীন^১ যুদ্ধের পরই ঘনিয়ে আসে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের মহালগ্ন। সুলতান ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কতো বছর ধরে এই লগ্নটির জন্যে! কাজী ইবনে শাদাদের ভাষায়—

‘আলকুদস’ বা বাইতুল মাকদিস-এর বিজয়-চিন্তা ছিলো তাঁর মাথায় অ নে ক বড় পাহাড়সম চিন্তা! বরং আরো ভারী!

২৭ শে রজব ৫৮৩ হিজরীতে সুলতানের সামনে হাজির হয়েছিলো বাইতুল মাকদিসে প্রবেশের মহালগ্নটি! নব্বই বছর পরে ফিরে এলো প্রথম ক্বিবলা -যেখানে আল্লাহর রাসূল ইসরা-রজনীতে নবী-রাসূলদের ইমামতি করেছিলেন- ইসলামের কোলে! মুসলমানদের -আবেগ ও ভালোবাসার- তত্ত্বাবধানে! এ-ই ছিলো আসলে মহাশক্তিধর সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা যে, বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করবেন সুলতান সালাহুদ্দীন সেই একই তারিখে, যে তারিখে বাইতুল মাকদিসে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ‘মিরাজে’ ধন্য করেছিলেন!

অন্য আরেক জায়গায় ইবনে শাদাদ বলেন—

‘সুলতান ছিলেন খু উ ব সদাচারী-উন্নত নৈকিতায় পুষ্ট। দানের হাত ছিলো সদা প্রসারিত। লাজুকও ছিলেন ভীষণ। মেহমান এলে খুশি ও আনন্দে ঝলমল করতো তাঁর সারা মুখাবয়ব। অমুসলিম অতিথিকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। ...

একবার দেখলাম ‘সাইদা’র শাসক এসেছেন তাঁর কাছে। তিনি তখন নাসিরায়। তাঁকে খুব সমাদর করলেন। খেলেন একসঙ্গে বসে। দাওয়াতও দিলেন ইসলামের। তুলে ধরলেন তার সামনে ইসলামের সুন্দর সুন্দর নানা দিক। উদ্বুদ্ধ করলেন তাকে ইসলামের প্রতি।’^২

সুলতান ছিলেন মহানুভব। নরোম হৃদয়ের অধিকারী। মাজলুমের ‘কান্না’ সহিতে পারতেন না। ব্যথিত হতেন। শোকে-শোকে আহত হতেন। তার পাশে দাঁড়াতে সাহসনা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে।

১ ৫৮৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো এবং খৃস্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয়েছিলো ‘সুস্পষ্ট বিজয়’।

২ আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা- ২৪

ইবনে শাদাদের ভাষায়- ১

‘একদিন আমি সুলতানের সাথে ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। আমরা ছিলাম একেবারে ক্রুসেডারদের সীমানায়। এর মাঝেই দেখলাম এক মুসলিম সৈন্য এক ক্রুসেডার মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। মহিলাটি আহাজারি করছিলো আর দুঃখে বেদনায় বুক চাপড়াচ্ছিলো। সুলতান সৈনিকের কাছে এর অবস্থা জানতে চাইলে সৈনিকটি বললো, সে আপনার সাথে দেখা করতে চাইছিলো। তাই নিয়ে এসেছি! সুলতান অনুবাদকের মাধ্যমে মহিলার অশ্রুপাত ও আহাজারির কারণ জানতে চাইলেন। মহিলা জানালো- একদল মুসলিম ‘ডাকু’ আমার তাঁবুতে ঢুকে আমার ছোট্ট মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেছে! সারাটা রাত আমি চিৎকার করে-করে সাহায্য চেয়েছি! সকালে একজন আমাকে বললো- সুলতান খুব দয়ালু-মহানুভব! চলুন তাঁর কাছে আপনাকে আমরাই নিয়ে যাচ্ছি! আমি এখন আপনার কাছেই আমার মেয়েকে ফেরত চাই!’

সুলতানের দয়ালু মনে মায়া-মমতার কোমল ঝড় উঠলো। চোখে নেমে এলো সেই দয়া- ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু হয়ে! দুলে উঠলো তাঁর নৈতিক মানবতাবোধ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ঘোড়সওয়ার ও সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দিলেন- ‘সৈন্য বাজারে’ গিয়ে মেয়েটিকে খুঁজে আনতে! যে-ই ওই ‘ডাকুদের’ কাছ থেকে ওকে কিনে থাকুক, তাকে পূর্ণ মূল্য উসুল করে অবশ্যই যেনো মেয়েটিকে অবিলম্বে নিয়ে আসে!

তাই হলো। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই ঘোড়সওয়ার মেয়েটিকে কাঁধে করে (সুলতান ও মায়ের সামনে) হাজির হলো! চোখ পড়তেই মা ছুটে গেলো মেয়ের দিকে, চোখভরে ওকে দেখতে! তারপর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে! ঘষলো নিজের চেহারা মাটিতে! এভাবেই সে আল্লাহর সামনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে-লাঞ্ছিত করে কৃতজ্ঞতা জানালো আল্লাহকে। সুলতানকে। (এ ছাড়া কৃতজ্ঞতা জানানোর আর কোনো ভাষাই সে খুঁজে পেলো না।) মানুষ তার

১ ৫৮৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো এবং খৃস্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয়েছিলো ‘সুস্পষ্ট বিজয়’।

অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। এরপর সে আকাশ পানে (নীরবে) তাকিয়ে রইলো! কী জানি, (আকাশকে) সে কী বলছিলো! তারপর তার সন্তানকে তার নিকট সোপর্দ করা হলো এবং তাকে নিজের তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়া হলো।^১

সুলতান মৃত্যুবরণ করেন ফজরের পর পর। দিনটা ছিলো ৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর বুধবার।


ইবনে শাদাদের ভাষায়—

মৃত্যুকালে সুলতান সোনা-দানা কিছুই রেখে যান নি। শুধু ৪৭টি নাসেরি দিরহাম ছাড়া। আর এক গ্রাম স্বর্ণ।

না, তাঁর কোনো রাজত্ব ছিলো না। কোনো বাড়ি ছিলো না। কোনো ভূ-সম্পদ ছিলো না। না, কোনো বাগ-বাগিচাও ছিলো না। জনপদের মালিকও ছিলেন না তিনি। ক্ষেত-খামারও ছিলো না তাঁর। আসলে সম্পদ বলতে কিছুই ছিলো না! দাফন-কাফন সম্পন্ন করার মতো একটি দিরহামও ছিলো না! নির্ভর করতে হয়েছিলো ঋণের উপর! শুধু তাই নয়; (কবরের) মাটিভেজার মতো সামান্য ঘাষের মূল্যও হাতে ছিলো না! যা যা লেগেছিলো তাঁর দাফন-কাফনে সবই ব্যবস্থা করেছিলেন মহান কাজী নিজস্ব উদ্যোগে।^২

১ আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা-২৬। এখানে صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس من الصليبيين
কিতাবটিকে ঘটনা বর্ণনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। লেখক- ড. আবদুল্লাহ নাসেহ উলওয়ান। পৃষ্ঠা-১০১

২ আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা- ২৫১



এভাবেই দিক বদলায়
এভাবেই মন বদলায়
এভাবেই ইমানের হাওয়া বয়ে যায়

এবার এসো এক জালিম সম্প্রদায়ের কথা বলি। মহাজালিম।
এদের কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে অথবা আরেকটু বড় হয়ে পড়বে
ইতিহাসের পাতায়। এরা তাতার। এরা হামলে পড়েছিলো সপ্তম
হিজরীতে সারা মুসলিম বিশ্বের উপর হিংস্র দানবের মতো।
জুলুম-নীপিড়ন-হত্যাযজ্ঞের সে এক রক্তমাখা বেদনাদায়ক ইতিহাস।
পড়লে গা ছমছম করে। রক্ত শীতল হয়ে যেতে চায়। মাঝে মাঝে
জ্বলেও ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে—

সত্যি এমন হয়েছিলো?

এমন ঘটেছিলো?

কিন্তু কেমনে? কীভাবে? অকল্পনীয়!

তাতার আক্রমণে মুসলিম বিশ্ব ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো। এরা
এক মহাফেতনা ও পরীক্ষা হয়ে দেখা দিলো। এরা মুসলিম বিশ্বের
জন্যে বয়ে আনলো মহাদুর্দিন। কালোদিন। এক মাথা

থেকে আরেক মাথা এরা পিষে বেড়াতে লাগলো। মুসলিম বিশ্ব
কঁপে উঠলো। এখানে ওখানে সবখানে। মৃতপ্রায় দুর্বল আব্বাসীয়
খেলাফত কাঁপতে লাগলো। প্রমাদ গুনতে লাগলো। সারা মুসলিম
বিশ্বে কতো দেশ কতো রাজা ও শাসক! কিন্তু কেউ এদেরকে রুখে
দাঁড়ানোর সাহস করতে পারলো না। হিংস্র দানবের মতো ত্রাস
ছড়াতে ছড়াতে এরা এগিয়ে যেতে লাগলো—

এক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আরেক ধ্বংসযজ্ঞের দিকে।

এক রক্তগঙ্গা থেকে আরেক রক্তগঙ্গার দিকে।

শাসকদের কাপুরুষোচিত পলায়নে এবং হীনমন্যতায় প্রজাকুল ও
সাধারণ মানুষের ভেতরে ছেয়ে গেলো—

হতাশার কালো-কালো ছায়া।

দুর্দিনের কালো কালো মেঘ।

প্রতিরোধহীন তাতারু তাণ্ডবে কাঁপতে লাগলো মানবতার আত্মা!

মুখে মুখে ‘প্রবাদই’ হয়ে গেলো—

إذا قيل لك : إن التتر قد انهزموا فلا تصدق.

যদি কেউ এসে তোমাকে বলে— (এই শুনেছো?) তাতার পরাজিত
হয়েছে, তাহলে একদম বিশ্বাস করবে না!

এই সর্বগ্রাসী ও ‘সর্বনাশী’ তাতার বাহিনীর সেনাপতি ও সর্বাধিনায়ক
চেঙ্গিস খানের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের যে চিত্র এঁকেছেন
এক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক, তা-ই আমি তোমার জন্যে তুলে
ধরছি। এ-ই যথেষ্ট। লক্ষ্য করো তার ভাষায়—

‘চলার পথে যতো শহর পড়ছিলো সব তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিলেন।
(জীবনের) গতি-প্রবাহ বদলে দিচ্ছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী ভীত-সন্ত্রস্ত
মানুষে ভরে গিয়েছিলো মরুভূমি। চলার পথে বসবাসযোগ্য যা
পাচ্ছিলেন সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন। একজন মানুষও
বঁচে থাকতে পারলো না। (এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখার জন্যে) বঁচে
রইলো শুধু একপাল কুকুর। নেকড়ে। শকুন। আর বিড়াল।’^১

১ চেঙ্গিস খান, হেরল্ড ল্যাম্ব, (Harold Lamb) ইংরেজি, পৃষ্ঠা-১২

সবকিছুতেই যুক্তি চলে। সবকিছু নিয়েই আগাম কথা বলা যায়। তবে এ ব্যাপারে সবাই স্থির নিঃসন্দেহ ছিলো যে, তখন মুসলমানেরাই ছিলো সবচেয়ে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত সম্প্রদায়।

* * *

তবে সময় একভাবে যায় না। যা ‘অসম্ভব’ মনে হচ্ছিলো তা-ই একদিন সম্ভব হয়ে গেলো। আল্লাহ চাইলে কী-না হয়? স-ব হয়! আল্লাহর পথের দাঈ ও আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে একদিন ‘অসম্ভব’ সম্ভব হয়ে গেলো! বদলে যাওয়ার এ গল্প দীর্ঘ। সব তো আর এখানে বলা যাবে না, বলা সম্ভবও না। শুধু একটি ঘটনা বলি!

* * *

তুঘলক তাইমুর খানের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। তিনি ছিলেন কাশগরের বাদশার ছেলে। তিনিই ছিলেন ভবিষ্যত উত্তরসূরী। যদিও তখনো যুবরাজ হিসাবে তার নামে শপথ নেওয়া হয় নি। তার মাথায় কোনো মুকুটও পরানো হয় নি। কিন্তু রাজ্য জুড়ে তার একটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো।

তিনি শিকার করতে খুব পছন্দ করতেন। আগের যুগের রাজা-বাদশারা কমবেশি সবাই শিকারে যেতেন খুব ঘটা করে। শিকারের জন্যে তাদের নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকাও থাকতো। তারও ছিলো একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে ছিলো দৃষ্টিকাড়া বন-বনানী। গহীন বন। ইচ্ছে হলেই শিকারে বের হয়ে বেশ শিকার করা যেতো। এই সংরক্ষিত এলাকায় তিনি এবং তার বিশেষ অনুচরদের ছাড়া আর কারো প্রবেশের অনুমতি ছিলো না। এই অনুচর দল শিকারের কাজে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করতো।

সেকালে রাজা-বাদশারা শিকার করার জায়গাটা এক রকমের দুর্গ বানিয়ে রাখতো। সেখানে অন্য কারো প্রবেশ ও দখলদারিত্ব সহ্য করা হতো না। চারদিকে বসানো হতো কঠিন পাহারা। এখানেও তাই। যুবরাজ তুঘলক তাইমুর ও তার শিকারী দল ছাড়া এখানে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিলো না। প্রবেশ তো দূরের কথা, কেউ

এসে একটু উঁকি দিয়ে দেখারও সাহস করতো না।

কিন্তু আল্লাহ এমন কিছু চাইলেন, যা তুর্কিস্তানের শাসক-পরিবারে পরিবর্তন ঘটাবে! তাদের অনুসারীদেরকে-পৃথিবীকে তছনছ করে দেওয়া বর্বর এই দলটাকে বদলে দেবেন! আল্লাহর ইচ্ছে হলো- এখন শিকার-ভূমির এই সংরক্ষিত ছোট জায়গা থেকে নিয়ে যাবেন তাদেরকে- চিরসৌভাগ্যের সুখ-ঠিকানায়! এখন ইসলামের মহান মুহাফিজ ও পাহারাদারে পরিণত হবে এরা! এখন এদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম ও মুসলিম-বান্ধব এক মহাসাম্রাজ্য! ওই সাম্রাজ্যে একটি পতাকাই শুধু উড়বে-ইসলামের পতাকা!

না, আর দেরি নয়! শুরু করছি বর্বর তাতারের বদলে যাওয়ার কাহিনী! আর এর পেছনে রয়েছেন আল্লাহওয়ালা বুয়ুর্গানে দীন! তাঁদের ঈমানদীপ্ত দাওয়াত! শুরু থেকেই বলি!

* * *

শায়খ জামালুদ্দীন বের হয়েছেন বুখারা থেকে। তাঁর সঙ্গে আছেন একদল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁরা পথ চলছিলেন তুঘলক তাইমুর খানের এই এলাকার কাছ দিয়েই। হঠাৎ ঘটলো ঘটনা। তাঁরা অনিচ্ছায় অসতর্কতায় ঢুকে পড়লেন এই সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ এলাকায়! তাঁদের জানাই ছিলো না যে, এখানে যুবরাজ ও তার শিকারী দল ছাড়া আর কারো প্রবেশ নিষেধ!

একটু পরই রাজ-নিরাপত্তা প্রহরীরা তাঁদের সবাইকে ঘিরে ধরলো! যুবরাজের সামনে আনা হলে তিনি নির্দেশ দিলেন- সবার হাত-পা বেঁধে আমার চোখের সামনে সবাইকে হত্যা করো! নাক-কান-পা-সব আলাদা করে ফেলো!!

পারস্যের লোক ছিলো তাতার সম্প্রদায়ের চোখে- হীন, তুচ্ছ। দু' চোখের বালি। শায়খ জামালুদ্দীন এবং যুবরাজ এখন মুখোমুখি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তুঘলক তাইমুর খান জানতে চাইলেন-

-এই নিষিদ্ধ সীমানায় ঢোকার দুঃসাহস কোথায় পেলে তোমরা?!

শায়খ জামালুদ্দীন শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন-

-আমরা ভিনদেশী! অজ্ঞতা ও অসতর্কতার কারণে এখানে ঢুকে

পড়েছি! আমাদের জানা ছিলো না যে, আমরা কোনো নিষিদ্ধ ভূখণ্ডে পথ চলছি!

এবার যুবরাজের চেহারা একটু কুঞ্চিত হলো। বললেন—

-তোমরা কোন দেশের? কোন জাতি?!

-আমরা পারস্যের!

-পারস্যের? পারস্যের মানুষের চেয়ে কুকুর অনেক মূল্যবান!!

এর উত্তরে কী বলবেন শায়খ জামালুদ্দীন? না, তাঁকে উত্তর নিয়ে ভাবতে হলো না! আল্লাহ তাঁর অন্তরে একটি উত্তর ঢেলে দিলেন। তাঁর মনের পর্দায় সুন্দর করে ভেসে উঠলো একটি উত্তর! তিনি যুবরাজের রুঢ়তায় বিচলিত হলেন না! রুঢ়তার বদলায় একটুও রুঢ় হলেন না! বরং আশ্চর্য গভীর কোমল কণ্ঠে (একান্ত মানুষের সাথে কথা বলার মতো) বললেন—

-আপনি ঠিকই বলেছেন! আমরা আগে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলাম! নাপাক ছিলাম! কিন্তু ‘সত্য দীন’ গ্রহণ করলাম যখন, তখন আমরা সোনা হয়ে গেলাম!!

এই প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে যুবরাজ বিস্মিত চোখে লা-জওয়াব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন!

এই জওয়াব কি ‘রুদ্ধ দ্বার’ খুলে দেবে?

আন্তরণের নিচে চাপা পড়ে থাকা ‘সুপ্ত সত্য’ কি জেগে উঠবে? ...

যুবরাজ প্রহরীদের দিকে তাকালেন। নির্দেশ দিলেন—

একে এখন নিয়ে যাও! আমি শিকার থেকে ফিরে এলে আবার আমার সামনে হাজির করবে!

* * *

আবার যুবরাজ বসলেন শায়খ জামালুদ্দীনকে নিয়ে। একা একা। যুবরাজ আগের মতো এখন রুক্ষ না—কোমল স্নিগ্ধ। চোখে-মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে সত্যসন্ধানী স্নিগ্ধ ছায়া। শায়খের কাছে প্রথমেই তিনি জানতে চাইলেন—

-কোন দীন আপনাদেরকে সোনা বানিয়ে দিয়েছে! একটু বলবেন?!

শায়খ জামালুদ্দীন মৃদু হেসে তাকালেন যুবরাজের দিকে! তারপর
তাকে বোঝাতে লাগলেন—

ইসলাম! খুলে খুলে!!

ঈমান!! ভেঙে ভেঙে!!

জান্নাত! বড়ো চিত্তাকর্ষক করে!!

জাহান্নাম! বড়ো ভয়ানকরূপে!!

তাঁর কণ্ঠে ইসলামের ‘জালাল’ (মহিমা)!

তাঁর কথা বলার ভঙিতে দ্যুতিময় আশ্বস্তি!

ফল যা হবার তাই হলো!

যুবরাজ ‘আলোর সামনে’ ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগলেন! মোম
যেমন গলে গলে যায় ‘মাথায় জ্বলতে থাকা’ আগুনের উষ্ণ পরশে!

* * *

জান্নাতের কথা শুনে যুবরাজের মনে সুখের দোল উঠলো!

জাহান্নামের কথা শুনে যুবরাজের মনে কম্পন সৃষ্টি হলো!

যুবরাজ ঝুঁকে পড়লেন!

যুবরাজ ঢলে পড়লেন!

যুবরাজ আত্মসমর্পণ করলেন!

যুবরাজ আবেগমথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

আমি ইসলাম কবুল করে ধন্য হতে চাই! কিন্তু এক্ষুনি না!
রাজ-সিংহাসনে বসে! এখন ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলে আমার
প্রজাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো না! অনেক বাধা
এসে সামনে দাঁড়াবে! আমাকে আপনি একটু সময় দিন! আমার পূর্ব
পুরুষের রাজ্যের আমিই উত্তরাধিকারী। এ রাজ্য আজ কিংবা কাল
আমার কাছেই আসবে। তখন আমি ঘোষণা দিয়ে আপনার হাতে
হাত রেখে ইসলাম কবুল করবো!

* * *

শায়খ জামালুদ্দীন আনন্দিতচিত্তে ফিরে এলেন স্বদেশে। কিন্তু
আল্লাহর কী লীলা, তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন প্রচণ্ড! তিনি বুঝতে
পারলেন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনি়ে এসেছে! তখন কাছে ডাকলেন
প্রিয় পুত্র রশীদুদ্দীনকে! বললেন—

‘অচিরেই তুঘলক তাইমুর এক মহাবাদশা হবেন! সিংহাসনে তিনি

অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তুমি তাঁর কাছে ছুটে যাবে! গিয়ে আমার সালাম দেবে! বলবে— আমার পিতা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছেন আপনার সেই প্রতিশ্রুতির কথা, যা আপনি আমার পিতাকে দিয়েছিলেন! ...’

* * *

পিতার মৃত্যু রশীদুদ্দীনকে কাঁদালেও পিতার ‘মিশন’ তাকে আনন্দিত করে তুললো। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন আসবে তুঘলক তাইমুর খানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মহালগ্নটি! না, খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। ক’বছর পরই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন মুকুট-সম্রাট তুঘলক তাইমুর খানের রাজ্যে।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে কেমনে রাজ-দরবার পর্যন্ত যাবেন তিনি?! অপরিচিত মানুষকে প্রহরীরা নিশ্চিত পথেই আটকে দেবে! উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলে ভেতরে ঢুকতে দেবে না! রশীদুদ্দীনের মাথায় অবশেষে চমৎকার একটি চিন্তা এলো। রশীদুদ্দীন রাজপ্রাসাদের কাছে কোথাও দাঁড়িয়ে আযান দেবেন! আযানের শব্দ পেয়ে প্রহরীরা ছুটে এসে তাকে বন্দি করে নিয়ে যাবে সম্রাটের কাছে! হ্যাঁ, এ-ই তো ভালো!

* * *

একদিন ভোরে তুঘলক তাইমুর খান শুনতে পেলেন একটি আওয়াজ! অপরিচিত! কিন্তু কেমন যেনো মিষ্টি মিষ্টি! তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো! বাইরে বাইরে তিনি বেশ বিরক্ত! প্রাসাদের প্রহরীদের কাছে জানতে চাইলেন— কে এই ‘বজ্জাত’, সকালের মিষ্টি ঘুমটা আমার ভেঙে দিয়েছে?! প্রহরীরা তখন বললো, এক পারসিক! নিজের ধর্ম পালন করে এভাবে ‘আযান’ দিয়ে। তারপর ‘নামায’ পড়ে। ধরে আনো ওকে!!

* * *

রশীদুদ্দীন তুঘলকের হাতে বাবার চিঠি হস্তান্তর করলেন। চিঠি পড়েই হাসিমুখে তাকিয়ে তুঘলক বললেন, আমি সত্যি সত্যি সিংহাসনে বসে সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভাবছিলাম আর ভাবছিলাম! কিন্তু তোমার বাবা কোথায়? তিনি নিজে এলেন না কেনো?! রশীদুদ্দীন গম্ভীর কণ্ঠে তুঘলককে তার বাবার ওফাতের খবর জানালেন!!

* * *

এই মৃত্যুসংবাদে তুঘলকের মন যেনো কেঁদে উঠলো! আহা, তিনি তুঘলকের কতো বড় মুহসিন ছিলেন!! তুঘলক আর দেরি করলেন না, কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন তখন তখনই!! এরপর দেখা গেলো বিস্ময়! মহাবিস্ময়! ‘রাজকীয় দাপট নিয়ে তুঘলক একে একে সব রাজ-সদস্যদের কাছে ইসলাম পেশ করলেন এবং তা কবুল করে ধন্য হতে বললেন! সবাই একে একে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাই করলো! কালেমায়ে শাহাদত পড়ে সবাই ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় নিলো! সবার আঁধার পৃথিবীতে উদিত হলো ইসলামের লাল সূর্য!

* * *

এভাবেই ইসলামের রবি উঠলো। আলো হাসলো। তাতারের অন্ধকার উদয়াচলে। কৃতিত্ব কার? সেই মহান দাঈদের, যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ জওয়াব দিয়ে এবং ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে খুলে দিয়ে গেছেন তাতারের ঈমানের ‘রুদ্ধ-দ্বার’!

লক্ষ্য করো এক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকের বক্তব্য—

‘ইসলাম আবার উঠে দাঁড়ালো সেই অতীতের মাহাত্ম্যগাথার নিচ থেকে। মুসলিম দাঈদের মাধ্যমে (কল্যাণে ও বরকতে) আকৃষ্ট হলো সেইসব বিশ্ববিজেতাদের মন (এই ইসলামের দিকে), যারা এক সময় সর্বশক্তি ব্যয় করেছে মুসলিম নির্যাতনে। শেষ পর্যন্ত এই এরাই (এই মহান দাঈদের চেষ্টায়) ইসলাম কবুল করলেন।’

বন্ধু!

শেষ কথাটা কী?

শেষ কথাটা হলো, এই বর্বর তাতার সম্প্রদায়ের ভেতরে এই-যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো, এর পেছনে কোন্ জিনিসটি কাজ করেছে সবার আগে?! শায়খ জামালুদ্দীনের সেই জওয়াব! সত্যি, মাঝে মাঝে ইখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ একটি কথাই হয়ে ওঠে আল্লাহর ইচ্ছায় বড় বড় বিপ্লব ও মহা মহা পরিবর্তনের সূচনা-কারণ! একটি সুসজ্জিত ও দীর্ঘকালীন যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীর চেয়েও বেশি প্রভাবময়! বিভাষ্য!

শ্রদ্ধা করে দিলে বিনিময় দাবে আল্লাহর কাছে

এ পর্যন্ত তোমরা যে সব গল্প ও কাহিনী পড়েছো তার সবই ছিলো ইসলামের সোনালি যুগের গল্প ও কাহিনী। নববী যুগ। সাহাবী যুগ। খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। এবং সেই যুগ, যখন ইসলাম ছিলো বিজয়ী। মুসলমানেরা ছিলেন বিজেতা। আল্লাহর বাণী ও কথা ছিলো সবার উপরে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও আদর্শ ছিলো অনুসরণীয় বরণীয়। মোটকথা, কল্যাণের ধারা যে যুগে ছিলো প্রবল গতিতে প্রবহমান। আলোর মিনার ছিলো দ্যোতিত, সমুচ্চ।

* * *

কিন্তু ইসলামের গাছ চিরফলবান। ইসলামের চাক থেকে মধু-সৃষ্টি কখনো বন্ধ হয় না! এখন তোমাদেরকে বলবো আরো দু'টি ইতিহাসের গল্প। ইমানের গল্প। নৈতিকতা গঠনের গল্প। তেরোশো হিজরী শতকের গল্প। তখন সাযিদ্ আহমদ শহীদ (আহমাদ ইবনে ইরফান আশ শহীদ রহ.) আমাদের হিন্দুস্তানের বুকে-ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে

অ নে ক দূরে বসে একটি জামাত গড়ে তুলছিলেন। শত শত
বাতিল আকিদা-বিশ্বাসের ভিড়ে, দুর্বল শক্তিহীন বিচ্যুত প্রশাসনের
ভেতরে তিনি এই জামাতটিকে গড়ে তুলছিলেন—
বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করে করে।

তাকওয়ার পাঠ তাদের সামনে মেলে ধরে ধরে।
সুনতে নববীর নূর তাদের দিলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে।
জিহাদী জযবা ও স্পৃহায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে করে।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরে।
সর্বোপরি চেষ্টা ও সাধনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে
সত্যিকারের একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সবুজ-স্বপ্ন বুকে নিয়ে
এবং সবার বুকে তার বীজ বুনে-বুনে তিনি গড়ে তুলছিলেন এই
কাফেলা। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না-হলে— কেমনে আল্লাহর
বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে— ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিকজীবনে,
সাধারণজীবনে এবং সমাজজীবনে?!

এসো, এই হৃদ-বিপ্লবের বিশ্বয়ে ভরা এবং ইসলামী অগ্রযাত্রার আলোয়
ভাসা নিকট-ইতিহাসের দুটি গল্প তোমাকে শোনাই। প্রথমেই প্রথম গল্প।

* * *

সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর দুই খাদেম। একজনের নাম
লাহুরী। আরেকজনের নাম এনায়াতুল্লাহ। লাহুরী ভদ্রলোক।
অভিজাত। সজ্জন। খুব বিনয়ী। অপরদিকে এনায়াতুল্লাহ সায়্যিদ
আহমদ শহীদের খুব কাছের মানুষ। অনেক দিন ধরে আছে
শায়খের সান্নিধ্যে। এই দুইজন মিলে শায়খের ঘোড়ার সেবায়ত্ন
করতো। পানি লাগলে পানি দিতো। খাদ্য লাগলে খাদ্য সংগ্রহ করে
আনতো। আরো যা যা প্রয়োজন সবই তারা দুজন মিলে করতো।
একবার হলো কি, এনায়াতুল্লাহ ক্ষেপে গিয়ে লাহুরীকে ঘুষি মেরে
একেবারে জমিনে ফেলে দিলো! ব্যথায় বেচারা লাহুরী গোঙাতে লাগলো।
মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। ‘আহ-ওহ!’ করতে লাগলো।
আমীরে কাফেলা শায়খ সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর কাছে

ঘটনার খবর চলে গেলো। সব জেনে তিনি খুব পেরেশান হলেন। এনায়াতুল্লাহর প্রতি খুব রুষ্ট হলেন। তাকে খুব বকাঝকা করলেন। বললেন- আমার কাছে তোমার একটা অবস্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে মনে করে তুমি লাহুরীর প্রতি এই নির্দয় আচরণ করেছো! তুমি ভেবেছো মর্যাদায় ও আভিজাত্যে তুমি লাহুরীর চেয়ে উপরে?! সাবধান! ধোঁকায় পড়বে না!! কান খুলে শুনে রাখো, আমার চোখে লাহুরী এবং তুমি এক সমান! বিলকুল বরাবর!! এখানে কারো উপর কারো প্রাধান্য নেই! এখানে সবাই এসেছে শুধু দীনের খাতিরে!

* * *

শায়খ দুজনের বিচারের বিষয়টা সামরিক আদালতে পাঠালেন। আর বিচারককে বলে দিলেন- সঠিক বিচার করুন! বেইনসারফী যেনো না হয়! কারো প্রতি কোনো রকমের পক্ষপাতিত্ব ও কোমলতা যেনো প্রকাশ না পায়! ফায়সালা করুন আল্লাহ আপনাকে যেভাবে ফায়সালা করতে বলেছেন! খেয়ানতকারীদের পক্ষে অবস্থান নেবেন না!

* * *

বিষয়টা তো একেবারেই স্পষ্ট। বিচারের রায় কী হবে, তাও মোটামুটি স্পষ্ট। লাহুরী এখন প্রতিশোধ নেবে। কিসাস নেবে। এনায়াতুল্লাহর কাছ থেকে। লাহুরী একটু পরই এনায়াতুল্লাহকে ঠিক সেভাবেই ঘুষি মারবে যেভাবে এনায়াতুল্লাহ লাহুরীকে ঘুষি মেরেছিলো। আঘাতের বদলে আঘাত! কিন্তু সবার মনেই একটা শংকা কাজ করছে! কেসাসের পর পরিস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠবে না তো! এমন হবে না তো- লাহুরী এনায়াতুল্লাহকে ঘুষি দিতে এলে এনায়াতুল্লাহ আবার রেগে গিয়ে উল্টো লাহুরীকেই খসে মারবে কিল-ঘুষি-থাপ্পড়! উপস্থিত সবাই চেষ্টা করতে লাগলো লাহুরী যেনো প্রতিশোধ না নিয়ে এনায়াতুল্লাহকে ক্ষমা করে দেয়! আল্লাহর ওয়াস্তে যেনো তাকে মাফ করে দেয়! আর এসব কসরত চলছে যাতে সামনে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়! এমন কি কাজী নিজেও লাহুরীকে তুষ্ট ও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন! ক্ষমা করে দিতে বলছেন! কাজীর সাথে সবাই যোগ দিয়ে লাহুরীকে ক্ষমা করার

ফযিলত বোঝাতে লাগলো। কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো-
ক্ষমা করে দিলে-প্রতিশোধ না নিলে আল্লাহর নিকট পাবে তুমি
বিরাট মর্যাদা! মহাবিনিময়!!

আর তুমি যদি ছাড় না দাও-ক্ষমা না করো, তাহলে তুমি আর
তোমার ভাই এনায়াতুল্লাহর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না! তুমি
অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা ও বিনিময়ও পাবে না!

লাহুরী এতোক্ষণ খুব মনযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনলো। সবাই
লাহুরীর জওয়াব শোনার জন্যে লাহুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে
রইলো। লাহুরী খুব সাদাসিধেভাবে বললো, আমি আমার অধিকার
আদায় করলে এবং আমার সঙ্গী থেকে কিসাস বা প্রতিশোধ নিলে
আমার কি কোনো গোনাহ হবে?!

সবাই বললো- না! বরং আল্লাহ তো বলেছেন-

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنْ اتَّبَعَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে নেয়, তার প্রতিদান
আল্লাহই দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।
আর যে ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম হওয়ার পর (সমান) বদলা নেয়,
এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হবে শুধু তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে
এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। এমন লোকদের জন্যে
রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি সবর করে এবং মাফ
করে দেয়, নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [শূরা : ৪০-৪৪]

লাহুরী বললো, তাহলে আমি আমার অধিকার ছাড়বো না! আমি
অবশ্যই প্রতিশোধ নেবো!

উপস্থিত জনতা একটু হতাশ! আর বুঝি কোনো আশা রইলো না!
লাহুরীকে বুঝি আর ফেরানো গেলো না! অগত্যা কাজী এগিয়ে
এলেন! এনায়াতুল্লাহকে লাহুরীর সামনে এগিয়ে দিলেন! আর
বললেন- এই যে এনায়াতুল্লাহ তোমার সামনে! মারো তাকে যেমন

তোমাকে মেরেছে! নাও তোমার আঘাতের প্রতিশোধ!!
লাহুরী কাজীর দিকে তাকালো। বললো- এটা কি আমার অধিকার নয়?
কাজী বললেন- হ্যাঁ, এটা তোমার অধিকার!
লোকেরা পেরেশান হয়ে তাকিয়ে রইলো! কী ঘটবে এখন?! নিশ্চিত
মনে হচ্ছে- লাহুরী ক্ষমা করবে না! প্রতিশোধ নেবেই!

* * *

কিন্তু যা মনে করা হয়েছিলো তা হলো না! বরং যা ভাবা হয় নি
তা-ই হলো!! লাহুরী সবাইকে সাক্ষি রেখে বলে উঠলেন- হে
জনতা, তোমরা তো শুনলে, কাজী আমাকে অধিকার দিয়েছেন
প্রতিশোধ নেওয়ার! আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে আঘাতের
বদলায় আঘাত করার! আমি ইচ্ছে করলে এখন আঘাত করতে
পারি! প্রতিশোধ নিতে পারি! কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না!
আমি কাউকে এখন ভয়ও পাচ্ছি না! কিন্তু হে আমার ভাইয়েরা!
তোমরা সবাই সাক্ষি থাকো, আমি আমার ভাই এনায়াতুল্লাহকে
মাফ করে দিলাম! শুধু আল্লাহর জন্যে! শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার
জন্যে!

এরপর লাহুরী এগিয়ে এলো এনায়াতুল্লাহর দিকে। চলে এলো কাছে,
একেবারে কাছে! তারপর তাকে বুকে টেনে নিলো! ভাতৃমমতায় জড়িয়ে
ধরলো! যেনো ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের দেখা হয়েছে যুগ-যুগ পরে!!
এদিকে উপস্থিত জনতার আনন্দের কোনো সীমা রইলো না! তারা
‘মারহাবা! মারহাবা!! বলে হর্ষধ্বনি করে উঠলো!! আর বলতে
লাগলো- হে লাহুরী, সত্যি তুমি মহান! তুমি মহাবীর!
আহা, প্রিয় লাহুরী যেনো এই আঘাতের উপর আমল করে
আমাদেরকেও বলে দিলো- তোমরাও সব হয়ে যাও ঠিক আমার
মতো! প্রতিশোধ নিতে পারলেও নেবে না! ক্ষমা করে দেবে! ক্ষমাই
তোমার উপরে ওঠার সিঁড়ি!

বন্ধু!
প্রথম কাহিনী এখানেই শেষ! এবার দ্বিতীয় কাহিনী! একটু ভিন্ন
শিরোনামে! চলো, এখন ওখানেই যাই!



আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যারা

মে মাসের দুই তারিখ। ১৮৬৪ ঈসাব্দী। ১২৮০ হিজরী। ইংরেজ জজ এডওয়ার্ডস আসীন হয়েছেন আম্বালা^১ আদালতের এজলাসে। তার পাশে বসে আছেন চারজন জুরি-সহযোগী উপদেষ্টা। এরা সবাই শহরের গন্যমান্য ব্যক্তি। নিজেদের মতামত প্রকাশ করার জন্যে এসেছেন। এদের সবার সামনে (আসামীর কাঠগড়ায়) দাঁড়িয়ে আছে এগারোজন মানুষ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কারো চেহারা অপরোধের ছাপ নেই। বরং সারা মুখাবয়ব জুড়ে ঝলমল করছে নির্দোষ ও নিরপরাধ মানুষের সাদাভ আভা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো- এই এরাই নাকি এই আদালতে মহাপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে! বলা হচ্ছে-

এরা নাকি হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত!
এরা নাকি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর অনুসারীদেরকে (গোপন)

^১ পূর্ব পাঞ্জাবের একটি বড় শহর। সেকালে তা ইংরেজদের একটি সামরিক ঘাটি ছিলো। ইংরেজ শাসনামলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এরিয়াও ছিলো এটি।

সাহায্য করে যাচ্ছে!

আরো সাহায্য করে যাচ্ছে মহান মুজাহিদ শায়খ ইসমাইল শহীদ
রহ.কে আফগান সীমানায়!

কখনো অর্থ-সম্পদ দিয়ে!

কখনো লোকবল পাঠিয়ে!

খুব কুশলী সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ অগোচরে নাকি এই সাহায্য ও
লোকবল পাঠানো হচ্ছে!

এরা নিজেদের ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করে দুর্বোধ্য সাংকেতিক
ভাষায়!

এরা খোদ ইংরেজ প্রজাদের কাছ থেকে 'সাহায্য' উঠিয়ে পাঠিয়ে
দেয় সীমান্তের বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে!

সবই গুরুতর অপরাধ! এদের এইসব অপরাধ ধরা পড়েছে
প্রশাসনের চোখে এক মুসলিম গুপ্তচরের সহায়তায়! তারপর এক
অভিযানে এদেরকে পাকড়াও করা হয়— পাটনা, থানেশ্বর ও লাহোর
থেকে। তারপর বিচারের মুখোমুখি করা হয় সবাইকে। আজ এই
আদালতে এদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হবে!

* * *

আদালতে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়। পা ফেলার জায়গা নেই।
আজকের রায় মুখে মুখে আলোচিত।

সময় হয়ে গেছে।

একটু পরই রায় ঘোষিত হবে!

সবাই তাকিয়ে আছে এজলাসের দিকে, বড় বড় চোখে!

উৎকর্ষ হয়ে!

অস্থিরচিত্তে!

ঠিক তখনই শোনা যায় ত্রুঙ্ক ইংরেজ বিচারক এডওয়ার্ডস-এর কণ্ঠ!

এগারো যুবকের এক যুবককে লক্ষ্য করে কথা বলছেন তিনি! সুন্দর
সুঠাম অভিজাত এক যুবক! দেখলেই বোঝা যায় ধনীর ঘরের
দুলাল! আরামে আয়েশে কেটেছে তার সকাল-বিকাল!

'জা'ফর! তুমি তো সুবোধ শিক্ষিত এক যুবক! রাষ্ট্রের আইন-কানুন
'জা'ফর! তুমি তো সুবোধ শিক্ষিত এক যুবক! রাষ্ট্রের আইন-কানুন

সম্পর্কেও তোমার বেশ জানাশোনা! শহরের নির্ভরযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় খান্দানের সন্তান তুমি! কিন্তু শত আফসোস, তুমি তোমার মেধা ও বুদ্ধি কাজে না লাগিয়ে ‘নষ্ট’ করেছো প্রশাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্তে ও বিদ্রোহে! আমরা জানতে পেরেছি, তুমিই হিন্দুস্তান থেকে বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে অর্থ ও জনবল পাঠানোর মধ্যস্থতা করছো!

জা‘ফর! তুমি ক্রমেই দুর্বিনীত ও হঠকারী হয়ে উঠছো! এক সময় যে তুমি (আমাদের) প্রশাসনের প্রতি একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলে, তা যেনো তুমি ভুলেই গেছো! শোনো, এক্ষুনি আমি তোমার বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণা করছি! তোমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! না, ফাঁসির পর পরিবারের কাছে তোমার লাশ হস্তান্তর করা হবে না! বরং অত্যন্ত অপমানভরে তোমাকে দাফন করা হবে রাজদ্রোহী হতভাগাদের মাকবারায়! বিশ্বাস করো, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত দেখলে আমি খুব খুশি হবো!’

* * *

যুবক এতোক্ষণ ধরে বিচারকের কথা শুনছিলো ধীর-স্থির-শান্ত-অবিচল ভঙিতে। কোনো রকমের অস্থিরতা ও পরিবর্তন তার চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র ছায়া ফেললো না। বিচারকের কথা শেষ হওয়ার পর শোনা গেলো জা‘ফরের শান্ত সুন্দর বজ্র-নিনাদ সত্য কণ্ঠ!

‘মানুষের আত্মা ও রুহ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না! তিনিই জীবনদাতা। তিনিই মৃত্যুদাতা। তুমি হে (মিথ্যা) আদালতের এজলাসে বসা কাজী, জীবন-মৃত্যুর মোটেই মালিক নও! তুমি এ-ও জানো না যে- আমার আর তোমার মাঝে কে আগে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে!

لَعْمُرْكَ مَا أَذْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُ * * * عَلَى أَيِّمَا تَعْدُو الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ
তোমার জীবনের কসম! আমি আসলে জানি না-আমি বরং শংকিত- আমাদের ভেতরে কার উপরে-যে মৃত্যু আগে নেমে আসে!

* * *

ইংরেজ বিচারক রাগে ক্ষোভে জ্বলতে লাগলো! তার মাথা কাজ করছিলো না! এই ছেলে এসব বলে কী! এখন একে আর কী বলে তিনি হুমকি দেবেন? সর্বশেষ তীরটা তো এর মাঝেই তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন! নাহ, তার তুণীয়ে আর কোনো তীর অবশিষ্ট নেই!

এদিকে ফাঁসির ঘোষণা শুনে জাফর বিচলিত তো হলোই না, উল্টো তার সারা মুখে নেমে এলো আনন্দ-জোছনার রূপোলি ধারা! জা'ফর যেনো জান্নাতের চিরসবুজ আবহে দাঁড়িয়ে আছে-অপার আনন্দের চিরস্নিগ্ধ ছায়ায়। তাকে যেনো ডাকছে হাতছানি দিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা হ্র! তার গায়ে এসে যেনো ছায়া ফেলেছে জান্নাতের আলিশান বালাখানা!

ধন্যবাদ হে কবি, বেশ বলেছো-

هذا الذي كانت الآمال تنتظر فليوف لله أقوام بما نذروا

আহারে! এই প্রতীক্ষাই না চলেছে দিনের পর দিন! এই, কোথায় আছো তোমরা? এবার পূরণ করো-না- তোমাদের স-ব মান্নত!

* * *

এদিকে উপস্থিত জনতার বিস্ময়ের কোনো অবধি রইলো না! এক ইংরেজ পুলিশ অফিসার এগিয়ে গেলো জাফরের কাছে সবিস্ময়ে। নাম বাসেন। গিয়ে বললো, এ কী! জীবনেও তো এমন দৃশ্য দেখি নি! তোমার বিরুদ্ধে ঘোষণা হয়েছে মৃত্যুর পরোয়ানা আর তুমি হাসছো পুষ্পের হাসি?!! জা'ফর বললো- কেনো আমি হাসবো না?! কেনো আমি আনন্দে উদ্বেলিত হবো না?! অবশ্যই আজ আমার আনন্দ-উল্লাসের দিন! আজ যে আমার শাহাদতের দিন! আল্লাহর পথে শহীদ যাঁরা মরার আগে এভাবেই হাসেন তাঁরা!! তুমি হে মিসকিন, এসব বুঝবে না!!

ইংরেজ বিচারক আরো দুজনকে ফাঁসি দিলো। একজন অনেক বৃদ্ধ। আল্লাহওয়ালা মানুষ। কী নূরানি চেহারা। ফাঁসির সংবাদ তাঁর কাছেও সুসংবাদ! তিনিও অনেক খুশি হলেন। আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তাঁর নাম মাওলানা ইয়াহইয়া আলী বোরী।

এই এগারোজনের আমীর তিনি। অপরজন হলো এক টগবগে যুবক। প্রথম দেখাতেই মনে হয় ধনীর ঘরের দুলাল। বড় কোনো ব্যবসায়ীর সন্তান। যুবকের বাড়ি পাঞ্জাব। নাম আলহাজ মুহাম্মদ শফী। বাকি আটজনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করলো বিচারক।

রায় শুনে উপস্থিত জনতা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো। এতিমহারা বোবা চাহনি নিয়ে সবাই একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। এগারোজনের প্রতি স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসায় সবার চোখে নেমে এলো অশ্রু। সবাই এদেরকে বিদায় জানাতে এবং শেষ দেখা দেখতে জেলখানা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেলো। এরা যেনো সবার হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ!

এক সময় এদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলখানায়। শুরু হলো নতুন নির্মমতা। সবার পরনের পোশাক খুলে ফেলা হলো। পরানো হলো সাধারণ কয়েদিদের বিশেষ পোশাক-অপরাধীদের পোশাক। তারপর তিনজন-তিনজন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ছোট ছোট অন্ধকার কামরায়। নেই আলো। নেই বাতাস। প্রচণ্ড গরমের ভেতরে এখানেই ওদেরকে রাত কাটাতে হলো। কী নিকৃষ্ট জায়গা ছিলো সেটা! এতো কষ্টঘেরা রাত মানুষের জীবনে কমই আসে।

* * *

সকালে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা খোলা প্রান্তরে। এ যেনো একটুখানি দয়া। আবদ্ধ জেলখানা থেকে উন্মুক্ত জেলখানায় নিয়ে যাওয়া। তবুও এরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। খোলা আকাশের নিচে প্রাণভরে শ্বাস নিলো।

কারাকর্তৃপক্ষ এদেরকে শাস্তি দিতে এর মাঝেই তোড়জোর শুরু করে দিলো। প্রস্তুত হয়ে গেলো ফাঁসির মঞ্চ। ‘আসামীদের’ চোখের সামনেই। কিন্তু আশ্চর্য! এরা ভয় পাচ্ছে না! বিচলিত হচ্ছে না! উল্টো ধীর-শান্ত হয়ে বসে আছে। মুখে ভয়ের ছাপ নেই। দৃষ্টিভার ছায়া নেই। মাওলানা ইয়াহইয়া আলীর খুশি যেনো আর ধরে না! এক টুকরো মিষ্টি হাসি লেগেই আছে তার ঠোঁটে।

জান্নাতের স্বপ্নে এখনই যেনো চলে গেছেন তিনি জান্নাতে! ফাঁসির
মঞ্চের কাছেই যেনো জান্নাতের অনিঃশেষ সুখ-আনন্দ! তিনি
এখনই যেনো ভাসছেন সেই সুখ-আনন্দে! আবেগে-উত্তেজনায় বার
বার তিনি গেয়ে উঠছেন কবিতা! তাঁর ‘পূর্ব পুরুষ’ হযরত খোবায়ব
যেনো ভর করেছে এসে এখন তার মাঝে! তাই তার কণ্ঠেও এখন
ধ্বনিত হচ্ছে সেই অমর খোবায়বী কবিতার মহাব্যঞ্জনা-

وذلك في ذات الإله وإن يشأ... يبارك على أوصال شلو ممزج
ولست أبالي حين أقتل مسلماً... على أي جنب كان في الله مصرعي

আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত! তিনি ইচ্ছে করলে আমার
ছিন্নভিন্ন দুর্বল দেহের টুকরোয় টুকরোয় বরকত ঢেলে দেবেন!
না! আমি কোনো পরোয়া করি না মৃত্যুর, যদি থাকি মুসলিম!
যেভাবেই হোক আমার মৃত্যু, হোক! শুধু আল্লাহর পথে হলেই আমি
হবো মহাধন্য!!

* * *

আগেই বলেছি, এই অবস্থা কমবেশি সবারই!
হাস্যোজ্জ্বল চিরসুখী চেহারা!
প্রশান্তিভরা চিরসুখী মন!
নামায পড়ছে তারা, খুশু-খুযুর এ-কী শ্রেষ্ঠ নমুনা!
একটুও সময় নষ্ট করছে না তারা!
এখন তিলাওয়াত!
তখন যিকির!
একটু পর পর আবার কবিতার মিষ্টি-মধুর ছন্দে অবগাহন!
আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফিসফিস সব নিবেদন!
তাদের অস্থির ব্যাকুলতার একটাই ভাষা-
জান্নাত, তুমি আর কতো দূর?
তোমার দীদার হে আল্লাহ, খুব কি দূর? নাকি কাছে?

* * *

বিচারক এডওয়ার্ডস মারা গেছে ফাঁসির রায় প্রদানের ক'দিন পরই হঠাৎ করে। আর বার্সেন নামের যে ইংরেজ সৈন্যটা মুহাম্মদ জা'ফরকে আটক করে একদিন দিনভর (সকাল আটটা থেকে রাত আটটা) বেদম নির্যাতন চালিয়েছিলো, সে-ও ভালো নেই! বেঁচে থেকেও মরা! এখন নাকি সে একটা বদ্ধ পাগল! এই পাগল অবস্থায়ই কয়েকদিন পর সে বাজে মৃত্যুর শিকার হয়! নির্যাতনে নির্যাতনে জর্জরিত মুহাম্মদ জা'ফরের বদ-দুআ লেগেছিলো নিশ্চয়ই! নির্যাতনের সময় মুহাম্মদ জা'ফর কসম করে বলেছিলো— দেখ্ জালিম! তুই পাগল হয়ে মরবি!

মাজলুমের কসম আল্লাহ কি ভাঙতে পারেন?!

رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره!

এমন কভো মানুষ আছে, চুল যার উস্কুখুস্কু, পোশাক যার জীর্ণবর্ণহীন, (হাত পাতলে) যাকে মানুষ (ধাক্কা দিয়ে) দরোজায় ফেলে দেয়, সে-ই যখন আল্লাহর নামে কসম করে (কিছু বলে বা কিছু চায়) আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না—কবুল করে নেন—বাস্তবায়ন করে দেখান! ^১

* * *

অনেক ইংরেজ নারী-পুরুষ কারাগারে এসে ভিড় করতো এদের কাছে। চলতো রাজ্যের ঠাট্টা-বিদ্রূপ। শত্রুদের এই পরিণতি দেখে ওদের কী উন্মাতাল খুশি! কিন্তু যে জায়গাটায় ওদের খটকা লাগতো তা হলো—

এরা এই অবস্থায় আনন্দ করছে কেনো?

কিসের এই হাসি-উল্লাস?

এরা কি মৃত্যুকে ভয় পায় না?

এরা কি জীবনকে ভালোবাসে না?!

কোনো কোনো কৌতূহলীর সবিষ্ময় প্রশ্ন—

এই, তোমরা এই অবস্থায় হাসো কেমনে?!

^১ মুসলিম

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে?!!

ওই যে ফাঁসির মঞ্চ, তবুও কেনো এই আনন্দ?!!

জবাবে এগারোজনের কাফেলা বলে—

অবাক হচ্ছেো বুঝি?!! তোমরা আসলে জীবন-মৃত্যুর রহস্যই বোঝো না! যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াও তোমরা, আমরা সে মৃত্যুকেই বুকে মেশাই! কেননা এ মৃত্যু— সাধারণ কোনো মৃত্যু না—শহিদী মৃত্যু!! আমাদের আনন্দ-রহস্য লুকিয়ে আছে এখানেই!! এ মৃত্যু যাঁর হবে সে সোজা চলে যাবে জান্নাতে! উড়তে থাকবে জান্নাতের দিগন্তহীন আকাশে সবুজ পাখি হয়ে!!

* * *

উপস্থিত ইংরেজ নারী-পুরুষের মুখে আর কথা ফোটে না। কী বলবে তারা এই অদ্ভুত আনন্দের অদ্ভুত কারণ শোনে? তারা বরং ফিরে যায় ইংরেজ শাসকদের কাছে। গিয়ে শোনায নিজের চোখে দেখে আসা বিস্ময়-সংবাদ!

এরা গিয়ে সব বলে আর ওরা সব সবিস্ময়ে শোনে।

এরা বলে-বলে বিস্ময় প্রকাশ করে আর এরা শুনে-শুনে ক্রুদ্ধ হয়।

কাঁপতে থাকে! এ কী আপদ! এ কী বিপদ!!

এখন কী করবে তারা?

যদি এদেরকে ছেড়ে দেয় তাহলে ছেড়ে দিতে হবে এমন দুশমনকে, যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত! ছেড়ে দিলে আবার এরা একই পথে হাঁটবে! আর যদি ঘোষিত রায় অনুযায়ী ফাঁসি দেয়, তাহলেও বিপদ! এরা পেয়ে যাবে এদের কাক্ষিত বস্তু!! চড়ে বসবে স্বপ্ন পূরণের সোনার ভেলায়!!

* * *

ইংরেজ প্রশাসনের ঘুম উড়ে গেলো। অস্থিরতায়। দুশ্চিন্তায় বরং রাগে ক্ষোভে। তারা ভাবতে লাগলো— কী করা যায়। কী করা উচিত। অবশেষে তারা খুঁজে বের করলো মাঝামাঝি একটা পথ। না ছেড়ে দেওয়া। না ফাঁসিতে ঝোলানো। বরং এদেরকেও বাকি আটজনের মতো দিতে হবে যাবজ্জীবন! চতুর ইংরেজের

তো আর বুদ্ধির অভাব হয় না! এক নিয়ম না হলে আরেক নিয়ম!

* * *

একদিন এক ইংরেজ বিচারক গেলো জেলখানায়। ফাঁসির আসামী তিনজনের সামনে গিয়ে শোনালো ফাঁসি বাতিল করে দেওয়ার রায়! পরিবর্তে যাবজ্জীবনের নতুন রায়! বললো—
হে বিদ্রোহীরা!

তোমরা ফাঁসি কামনা করছো?

ফাঁসিতে ঝোলার জন্যে ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছো?!

আল্লাহর রাস্তায় ‘শহীদ’ হতে চাইছো?!

না! আমরা তোমাদের সে স্বপ্ন পূরণ হতে দেবো না!

আমরা তোমাদেরকে খুশি হতে দেবো না!

তোমাদেরকে এবার পাঠানো হবে দ্বীপে—আন্দামান দ্বীপে!

* * *

১৮৬৫ সনের ৮ই ডিসেম্বর এগারোজনকে নির্বাসিত করা হলো আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্লেয়ারে। শায়খ ইয়াহইয়া আলী সেখানে মারা যান নির্বাসনের দু বছর পর। এই দু বছর ডুবে ছিলেন তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে। আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াতও দিয়েছেন অনেক। সময়টা ছিলো ১২৮৪ হিজরী। ২ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ সন।

এদিকে মুহাম্মদ জা‘ফর দীর্ঘ ১৮ বছর পর মুক্তি পায়। ২৮ শে জানুয়ারি ১৮৮৩ সালে।

আমরা এ কিতাবের শেষ গল্পের শেষ উপসংহার টানছি কুরআনের এই আয়াত দিয়ে—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا .

‘মুমিনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে আর কেউ কেউ (সেই মৃত্যুর-শাহাদাতের) প্রতীক্ষা করছে। তারা নিজেদের সংকল্প মোটেই বদলায় নি।’ [আহযাব- ২৩]